নির্বোধ

(নাটক)

সেদিন বঙ্গলক্ষ্মী ব্যাঙ্কে

(একাঙ্কিকা)

অজিত গঙ্গোপাধ্যায়

শঙ্কর পুস্তকালয় ॥ কলিকাতা ৪ ॥

প্রথম প্রকাশ

১লা বৈশাখ ১৩৬৩

প্রকাশক

শঙ্কর পুস্তকালয়

৭২ ভূপেন বসু এ্যাভিনিউ

কলিকাতা-৪

পক্ষে সতীশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রচ্ছদপট সতীশঙ্কর

প্রিণ্টার্স—শ্রীকালিদাস মুন্সী, ২১ বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৪

কাগজ সাপ্লাই—১৪।২ ওল্ড চায়না বাজার ষ্ট্রীট

ব্লক—ঊষা আর্ট স্টুডিও, ২ডি নবকুমার রাহা লেন, কলিকাতা-৪

বাঁধাই—এস, কে, ঘোষ, এণ্ড কোং ২এ রামধন মিত্র লেন, কলিকাতা-৫

এই লেখকের লেখা অন্য নাটক

শকুন্তলা রায় ৩৲

আকাশ-বিহঙ্গী (যন্ত্রস্থ)

শ্রদ্ধেয় নাট্যকার

শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তকে

নির্বোধ

(ডসটয়েভস্কির কাহিনীর ছায়া অবলম্বনে)

চরিত্র-লিপি

তারকনাথ রায়	শহরের বিখ্যাত ধনী ব্যবসায়ী।
অপর্ণা রায়	তারকনাথ রায়ের স্ত্রী।
সুমিত্রা রায়	তারকনাথ রায়ের কন্যা।
অনিলেন্দু	তারকনাথ রায়ের প্রাইভেট সেক্রেটারী।
বিমলেন্দু	অনিলেন্দুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা।
শঙ্কর	রায়-বাড়ির একজন ভৃত্য।

মহিম।

আনন্দ।

কৃপানাথ	আনন্দের পরিচিত।

যতীন ও হরিশ।

রমেন	যতীনের ও হরিশের বন্ধু।

চিত্রা।

রঞ্জন।

সুরেন	রঞ্জনের ভৃত্য।

কাল—বর্তমান।

নির্বোধ

প্রথম অঙ্ক

[তারকনাথ রায়ের বাড়ির ভিতরের দিকে একখানি ঘর]

(শহরের বিখ্যাত ধনী তারকনাথ রায়ের বাড়ির ভিতরের দিকে একখানি ঘর। ঘরটি পূর্বমুখী। পূর্বদিকে কাচের শার্সিযুক্ত একটি জানালা। জানালার উপর রেশমী পর্দা ফেলা আছে। বাম ও দক্ষিণ পার্শ্বে দরজা। বাম দিকের দরজা দিয়া বাড়ির ভিতর যাওয়া যায়। কক্ষসজ্জা ধনীগৃহের উপযোগী—টেবিল, চেয়ার, সোফা, কৌচ, রেডিও ইত্যাদি। পরিবারের অন্তরঙ্গ কেহ আসিলে এই ঘরটি বসিবার ঘর হিসাবেও ব্যবহার করা হয়। গৃহস্বামীর একমাত্র কন্যা সুমিত্রার চিত্রাঙ্কনের শখ আছে। মাঝে মাঝে সে এই ঘরটি চিত্রাঙ্কনের জন্যও ব্যবহার করিয়া থাকে। বাম কোণে রহিয়াছে একটি ইজেল। ইজেলে আটকানো পটের উপর আঁকা রহিয়াছে একটি অর্ধ-সমাপ্ত দৃশ্যচিত্র। সম্মুখে বসিবার উপযুক্ত ছোট একটি কুশন। পার্শ্বে ড্রয়ার-সংযুক্ত একটি ছোট টেবিল। টেবিলে ও ড্রয়ারে সুমিত্রার আঁকিবার সরঞ্জাম থাকে। প্রাতঃকাল। ঘড়িতে সাতটা বাজিয়া গিয়াছে। বামদিকের দরজা দিয়া তারকনাথ রায় প্রবেশ করিলেন। তাঁহার মুখে পাইপ, গায়ে একটি ড্রেসিং গাউন জড়ান। রায়ের বয়স পঞ্চান্ন বৎসর, সুন্দর সুগঠিত স্বাস্থ্য, দীর্ঘ আকৃতি, উজ্জ্বল গৌর বর্ণ—দেখিলে পঞ্চাশ পার হইয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। রায়ের মুখে চোখে একটা উৎকণ্ঠার ভাব—দেখিলে মনে হয় কি একটা বিষয় যেন গভীর ভাবে চিন্তা করিতেছেন। তাঁহার পিছন পিছন একজন ভৃত্য প্রবেশ করিয়া জানালার নিকট আসিয়া পর্দাটা টানিয়া দিতেই প্রাতঃকালীন সূর্যালোকে ঘরটি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।)

রায়। (একটি সোফাতে বসিয়া) কে, শঙ্কর ?

শঙ্কর। আজ্ঞে—

রায়। অফিসঘরে অনিলেন্দু বাবু এলে আমায় খবর দিস তো—

শঙ্কর। আজ্ঞে, সেক্রেটারী বাবু তো এসেছেন—

রায়। (ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন) এসেছেন? আর কেউ আছে নাকি অফিসঘরে?

শঙ্কর। আজ্ঞে হ্যাঁ, অফিস ঘরে দুজন ভদ্রলোক বসে আছেন। বাইরের বৈঠকখানাতেও দুজন অপেক্ষা করছেন, আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে।

রায়। ও! আচ্ছা তাহলে—হ্যাঁ, তোর মা কি করছেন?

শঙ্কর। মা তো এইমাত্র পূজোর ঘরে ঢুকলেন।

রায়। আর দিদিমণি?

শঙ্কর। তিনি তো এখনো বিছানা ছেড়ে ওঠেন নি।

রায়। আচ্ছা—তাহলে তুই সেক্রেটারী বাবুকে এই ঘরেই আসতে বল।

শঙ্কর। যে আজ্ঞে—

(শঙ্কর বাহির হইয়া গেলে রায় চিন্তান্বিত অবস্থায় পায়চারি করিতে আরম্ভ করিলেন। অল্পক্ষণ পরেই দক্ষিণ দিকের দরজা দিয়া প্রবেশ করিল অনিলেন্দু, পিছনে রঞ্জন। অনিলেন্দুর হাতে একটি ফাইল। অনিলেন্দু রূপবান পুরুষ, স্বাস্থ্য ভাল, উচ্চতা মাঝারি—বয়স আটাশ বৎসর। মুখে একটা মৃদু হাসির রেখা লাগিয়াই আছে দেখা যায়, কিন্তু প্রতিকূল অবস্থার আভাস পাওয়া মাত্রই সে হাসির রেখা মিলাইয়া যায়। চোখের দৃষ্টি সন্ধানী। রঞ্জনের বয়স সাতাশ—কৃশ গঠন, মুখের দুইপাশ চাপা। বৈশিষ্ট্য ছিল তাহার বড় বড় দুইটি চোখে। সে চোখের দিকে তাকাইলে মনে হয় সেখানে উগ্রতা বা কপটতার লেশ মাত্র নাই—রহিয়াছে একটা স্বপ্নাচ্ছন্ন ভাব। রঞ্জনের হাতে একটি ছোট পুঁটলি। বেশ অতি সাধারণ।)

রায়। এই যে অনিলেন্দু—(সঙ্গে আর একজনকে দেখিয়া থামিয়া গেলেন, মনে হইল বেশ যেন একটু বিরক্তও হইয়াছেন)—ইনি—ইনি কে?

অনিলেন্দু। ইনি আপনাদের কিরকম আত্মীয় হন—

রঞ্জন। (রায়ের দিকে অগ্রসর হইয়া সপ্রতিভ ভাবে) না, না, আত্মীয় আমি নই। আমার নাম রঞ্জন বসু—মানে—মিসেস রায়ের বাবাকে আমার বাবা গ্রাম সম্পর্কে কাকা বলে ডাকতেন।

রায়। (বিরক্তির সহিত) ও! তা কি প্রয়োজনে এসেছেন, জানতে পারি কি?

রঞ্জন। না, না, কোন বিশেষ প্রয়োজনে আমি এখানে আসি নি। আমার উদ্দেশ্য, আপনাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করা মাত্র। অসময়ে এসে আপনাকে বিরক্ত করেছি তার জন্যে সত্যিই আমি লজ্জিত। কিন্তু কোন্ সময়ে আপনারা বাইরের লোকের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করেন, তা আমার জানা ছিল না। আমি স্টেশন থেকে সোজা এখানেই আসছি—মানে—আমি ওয়াল্টেয়ার থেকে আজই কলকাতায় এসে পৌঁছেছি।

(রায় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আগন্তুকের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে-ছিলেন। তাঁহার মুখে একটা মৃদু হাসির রেখা ক্ষণেকের জন্য দেখা দিয়াই মিলাইয়া গেল।)

রায়। বসুন।

রঞ্জন। (চেয়ারে বসিয়া) ধন্যবাদ!

রায়। আলাপ পরিচয় করার মত সময় আমার হাতে নেই। তবে আপনার নিশ্চয় কোন একটা উদ্দেশ্য আছে—আপনি যদি দয়া করে—

রঞ্জন। (বাধা দিয়া) ঠিক এইটাই আমি আশা করেছিলাম। আমি জানতাম—আপনি গোড়া থেকেই ধরে নেবেন, বিশেষ কোন প্রয়োজনেই আমি আপনার কাছে এসেছি। কিন্তু বিশ্বাস করুন, একমাত্র আলাপ করা ছাড়া অন্য কোন্ উদ্দেশ্য নিয়ে আমি এখানে আসি নি।

রায়। শুনে বড় আনন্দ হ'ল। কিন্তু আমার হাতে এখন বড় বেশী কাজ। আর তাছাড়া আপনার সঙ্গে আলাপ করে সময় ব্যয় করার মত কোন কারণ—

রঞ্জন। (বাধা দিয়া) না, না, কারণ সত্যিই কিছু নেই। আমার বাবা মিসেস রায়ের বাবাকে কাকা বলে ডাকতেন। এটা যে কোন কারণই নয় তা আমি বেশ পরিষ্কার বুঝি। তবে কি জানেন? শুধু এইটুকু সূত্রের ওপর নির্ভর করেই আমার কলকাতা আসা। আজ চোদ্দ বছর আমি কলকাতাছাড়া—শুধু কলকাতা কেন, বাংলাদেশছাড়া। অসুস্থ দেহ ও মন নিয়ে আমাকে দেশ ছাড়তে হয়েছিল। জীবনের কোন অভিজ্ঞতাই আমার হয় নি—চোদ্দটা বছর এমন সব লোকের সঙ্গে কেটেছে, যাদের দেহ আর মন, দুই ছিল অসুস্থ। টাকাকড়ি সংক্রান্ত একটা ব্যাপারে আমার কলকাতায় আসা। এ কারণেও বটে, আর নিজের প্রয়োজনেও বটে, আপনার মত লোকের সঙ্গে পরিচয় থাকাটা আমার পক্ষে খুবই দরকার। ওয়াল্টেয়ারে থাকতেই আমি আপনার নাম শুনেছিলাম। তাই স্টেশনে নেমেই মনে হ'ল, আপনার সঙ্গে যখন পরিচয়ের একটা সূত্রই আছে তখন আপনাকে দিয়েই শুরু করা যাক। আর তাছাড়া আমার কি জানি কেন মনে হ'ল, আপনিই যে আমার প্রয়োজনে লাগবেন তা নয়, আমিও আপনার প্রয়োজনে লাগতে পারি।

রায়। (রঞ্জনের কথা বলার রীতি তাঁহাকে বিস্মিত করিয়া তুলিয়াছিল) আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে সত্যিই বড় আনন্দ হ'ল। কলকাতায় এসে উঠেছেন কোথায়? কোন হোটেলে?

রঞ্জন। কোথায় উঠব, এখনও কিছু ঠিক করে উঠতে পারি নি—

রায়। তার মানে? আপনি স্টেশন থেকে সোজা এখানেই এসেছেন সমস্ত মালপত্র নিয়ে?

রঞ্জন। মালপত্র বলতে আমার এই পুঁটলিটা—এটা আমার সঙ্গে সঙ্গেই থাকে।

রায়। তাহলে আপনি হোটেলে উঠবেন বলে ঠিক করেছেন ?

রঞ্জন। তাছাড়া আর কোথায় উঠি বলুন ?

রায়। (মৃদু হাসিয়া) আপনার কথাবার্তা শুনে কিন্তু মনে হচ্ছে, আপনি এখানেই থাকবেন বলে ঠিক করে এসেছেন।

রঞ্জন। (সপ্রতিভ ভাবে) আপনি অনুরোধ করলে, থাকলেও থাকতে পারতুম, কিন্তু কি জানেন ?—মানে—তবে সত্যি কথাই বলি—আপনি অনুরোধ করলেও, এখানে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব হ'ত না। (ব্যস্ত হইয়া) না, না, তাই বলে যেন মনে করবেন না, এর অন্য কোন কারণ আছে। কারো বাড়ীতে থাকাটা আমার প্রকৃতিবিরুদ্ধ—আর সেই কারণেই আপনার অনুরোধ রাখা আমার পক্ষে সম্ভব হ'ত না।

রায়। (মৃদু হাসিয়া) তাহলে তো দেখছি, আপনাকে অনুরোধ না করে আমি ভালই করেছি। অবশ্য অনুরোধ আপনাকে আমি করতামও না। তা যাক সে কথা—শুধু আমার সঙ্গে পরিচয় করা ছাড়া আপনার যখন আর কোন উদ্দেশ্যই নেই, তখন আমার মনে হয়—

রঞ্জন। (বাধা দিয়া) আমার এখন বিদায় নেওয়াই উচিত—এই তো ! (সপ্রতিভ ভাবে হাসিতে হাসিতে উঠিয়া দাঁড়াইল) জানেন মিস্টার রায়—যদিও বাস্তব জীবন সম্বন্ধে আমার কোন অভিজ্ঞতা নেই, তবু আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাতের ধরনটা যে এই রকমই একটা কিছু হবে, তা আমি আগেই জানতাম। ওয়াল্টেয়ার থেকে আমি আপনাদের একটা চিঠি লিখেছিলাম। যখন দেখলাম, আপনারা সে চিঠির কোন উত্তর দিলেন না, তখনই মনে হ'ল আমাদের আলাপ খুব বেশী দূর এগুবে না।

রায়। কিন্তু আপনি আমার স্ত্রীর সঙ্গে না দেখা করেই চলে যাবেন? আপনার সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তা আছে বলছেন—তিনি হয়ত আপনাকে দেখে আনন্দিতই হবেন। অবশ্য আপনার হাতে যদি সময় থাকে—

রঞ্জন। আমার সময়ের জন্যে ভাববেন না—সময় আমার হাতে প্রচুর! আর মিসেস রায়ের কাছে আমার নামটা হয়ত পরিচিত—চিঠিটা তাঁকেই লিখেছিলাম কিনা—

রায়। যদি কিছু মনে না করেন, একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি কি?

রঞ্জন। নিশ্চয় পারেন।

রায়। মানে—কোনরকম সাহায্য—মানে—আর্থিক—

রঞ্জন। (বাধা দিয়া) না, না, আর্থিক সাহায্যের কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না! আমি তো বলেছি আপনাকে—আমার এখানে আসার উদ্দেশ্যই হ'ল, আপনাদের সঙ্গে পরিচিত হওয়া—

রায়। (মৃদু হাসিয়া) আপনার সঙ্গে কথা কয়ে মনে হচ্ছে, অনেক সৌভাগ্য থাকলে আপনার মত লোককে পরিচিতের মধ্যে পাওয়া যায়! কিন্তু বসে দুদণ্ড আলাপ করি, তা পর্যন্ত হবার উপায় নেই—হাতে এত কাজ—

রঞ্জন। (সপ্রতিভ ভাবে) না, না, এতে আপনার সঙ্কোচ করার কোন কারণই নেই। কাজের সময় কাউকে বিরক্ত করাটা সত্যিই খুব অন্যায়। কিন্তু আপনি যে এ সময় কাজে ব্যস্ত থাকবেন তা আমি জানতাম না মিস্টার রায়। আর তাছাড়া আমার সঙ্গে আপনার আলাপ বেশীক্ষণ স্থায়ী হ'ল না বলে দুঃখ করারও কিছু নেই। আমার মনে হয় আমাদের দুজনের প্রকৃতির মধ্যে সাদৃশ্যের একান্ত অভাব।

রায়। (মৃদু হাসিয়া) আমারও তাই মনে হয় রঞ্জনবাবু—

রঞ্জন। (গম্ভীরভাবে) তবে এর মধ্যে একটা কথা আছে মিস্টার রায়। আমার মনে হয়, আমরা আমাদের প্রয়োজনের গণ্ডির বাইরে কোন লোককেই চিনতে চাই না—এ আলস্য আমাদের স্বভাবজাত। আমাদের মধ্যে প্রকৃতিগত সাদৃশ্য নেই—এটা আমরা কল্পনা করে নিই; কিন্তু আলাপ স্থায়ী হ'লে দেখা যায় সাদৃশ্য আমাদের মধ্যে রয়েছে অনেক বিষয়েই। কিন্তু এই দেখুন কথা কয়ে আবার আমি আপনার সময় নষ্ট করছি! আমার মনে হয়—

রায়। (বাধা দিয়া) আর একটা প্রশ্ন আমি আপনাকে করব। বর্তমানে আপনি করেন কি? চাকরি, না অন্য কিছু? অবশ্য উত্তর দিতে যদি কোন বাধা থাকে—

রঞ্জন। বাধা? কিছুমাত্র না! বর্তমানে জীবিকা সংস্থানের কোন উপায়ই আমার নেই। একটা চাকরি পেলে খুবই ভাল হয় এই পর্যন্ত বলতে পারি।

রায়। কি রকম চাকরি পেলে আপনার সুবিধে হয়, জানতে পারি কি?

রঞ্জন। যে কোন রকম চাকরি পেলেই হ'ল, বিশেষ চাকরি পাওয়ার মত বিশেষ যোগ্যতা আমার নেই। ওয়াল্টেয়ারে সেরে ওঠবার পর শিক্ষা কিছুটা পেয়েছি—কিন্তু ডিগ্রী একটাও পাই নি!

রায়। আচ্ছা—আপনি এতদিন ওয়াল্টেয়ারে ছিলেন কি কোন বিশেষ কারণে?

রঞ্জন। আজ্ঞে হ্যাঁ—চিকিৎসার জন্যে আমাকে ওয়াল্টেয়ারে থাকতে হয়েছিল—

রায়। চিকিৎসার জন্যে? কোন শক্ত অসুখ করেছিল নাকি আপনার?

রঞ্জন। হ্যাঁ—অসুখটা শক্ত বটে! তবে সেটা যতটা না দৈহিক, তার চেয়ে বেশী মানসিক।

রায়। তার মানে?

রঞ্জন। মানে—ছোটবেলা থেকেই আমার মাঝে মাঝে মূর্ছা হ'ত। ক্রমে সেটা রোগে দাঁড়াল। ঘন ঘন মূর্ছা যাওয়ার ফলেই হ'ক, বা অন্য কোন কারণেই হ'ক, বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে বুদ্ধির বিকাশ হয় নি একেবারেই!

রায়। মানে?

রঞ্জন। মানে—আমার অভিভাবক লক্ষ্য করলেন, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি যা হয়ে উঠছি, তাকে ঠিক মানুষ বলা চলে না—তাকে বলা যায় জড়, নির্বোধ—মানে, যাকে আপনারা ইডিয়ট বলেন।

রায়। তারপর?

রঞ্জন। আমার অভিভাবক বুঝেছিলেন—আমার বুদ্ধির জড়তা না কাটলে, আমাকে লেখাপড়া শেখানোর চেষ্টা বৃথা। তিনি আমাকে পাঠিয়ে দিলেন ওয়াল্টেয়ারে—বিখ্যাত মনোবিদ্ ডক্টর আলির এশাইলামে। ডক্টর আলির কাছে আমাকে প্রায় চোদ্দ বছর থাকতে হয়। তাঁর সুচিকিৎসায় আমি প্রায় সেরে উঠেছি বললেই হয়।

রায়। (মৃদু হাসিয়া) সে তো আপনার সঙ্গে কথা কয়েই বুঝতে পারছি। আপনি লেখাপড়াও কি ঐ ওয়াল্টেয়ার থেকেই করেছেন?

রঞ্জন। হ্যাঁ—মানে, নিয়ম-মাফিক স্কুল-কলেজে লেখাপড়া করার সুযোগ আমি পাই নি। অনেকদিন পর্যন্ত ডক্টর আলি আমাকে চোখ-ছাড়া করবার সাহস পান নি। তবে ডক্টর আলির কাছেই আমি ইতিহাস আর সাহিত্য নিয়ে কিছুটা পড়াশুনা করেছি।

রায়। আপনি যে বলছিলেন, আপনার অভিভাবক—তিনি আপনার বাবা?

রঞ্জন। আমার বাবা মা তুজনেই আমার চার বছর বয়সের মধ্যেই মারা যান। তারপর আমার ভার তুলে নেন আমার পিতৃবন্ধু কীর্তিনাথ রায়।

রায়। (বিস্মিত হইয়া) কীর্তিনাথ রায়—মানে—?

রঞ্জন। আজ্ঞে হ্যাঁ—বিখ্যাত ধনী, দানবীর কীর্তিনাথ রায়। আমার বাবার মৃত্যুর পর থেকে তিনিই আমার সমস্ত খরচ চালিয়ে এসেছিলেন। ওয়াল্টেয়ারে প্রতি মাসে তিনি টাকা পাঠাতেন। তাঁর মৃত্যুর পর গত তুবছর টাকা আসা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তবুও ডক্টর আলি আমাকে ছাড়তে চান নি। কিন্তু আমার নিজেরও লজ্জা করছিল আলির আশ্রয়ে থাকতে। এমন সময় একটা বিশেষ প্রয়োজনে আমাকে কলকাতা চলে আসতে হ'ল।

রায়। কলকাতায় আপনার এমন কোন আত্মীয় নেই, যাঁর বাড়িতে আপনি উঠতে পারেন?

রঞ্জন। না—বাড়ি গিয়ে ওঠার মত কোন আত্মীয়-স্বজন আমার নেই। দুর সম্পর্কের আত্মীয় যদি বা তু-একজন থাকেন, তাঁদের বাড়ি গিয়ে আমি উঠবই বা কেন? তাছাড়া কলকাতায় হয়ত আমাকে স্থায়ীভাবে থাকতে নাও হতে পারে। আমার এখানে আসার কারণ হ'ল একটা চিঠি—সম্প্রতি ওয়াল্টেয়ারে থাকতে আমি একটা চিঠি পেয়েছি—

রায়। (বাধা দিয়া) বর্তমানে আমি আপনাকে আমার অফিসে একটা কাজ দিতে পারি।—অবশ্য আপনি ভেবে দেখুন, চাকরি করা আপনার শরীরে সহ্য হবে কি না।

রঞ্জন। খুব সহ্য হবে! আর তা ছাড়া আমি নিজেও পরীক্ষা করে দেখতে চাই—আমি সত্যিই সেরে উঠেছি কিনা! (হঠাৎ ইজেলের দিকে দৃষ্টি পড়িতে, খুব উৎসাহিত হইয়া) আরও একটা বিদ্যা

আমার কিছু কিছু জানা আছে। আমি একটু-আধটু আঁকতেও পারি। আপনার সঙ্গে এতক্ষণ আমি কথা কইছিলাম—এখন আপনাকে না দেখেও আপনার মুখের একটা স্কেচ আমি এঁকে দিতে পারি।

রায়। তাই নাকি!

রঞ্জন। কেন বিশ্বাস হচ্ছে না? তার জন্যে চিন্তা নেই—আমি আপনাকে প্রমাণ করে দিচ্ছি! ভয় নেই, বেশী সময় লাগবে না! (অনিলেন্দুর নিকট আসিয়া) আপনার কাছে সাদা কাগজ আছে—যে কোন সাদা কাগজ? (অনিলেন্দু ফাইল হইতে একটি প্যাড বাহির করিয়া দিলে, সেটি লইয়া পুনরায় স্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া, রায় কিছু বলিবার পূর্বেই পকেট হইতে পেন্‌সিল বাহির করিয়া ছবি আঁকিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িল)।

রায়। (অস্ফুট স্বরে) আশ্চর্য! (অনিলেন্দুর নিকট আসিয়া অপেক্ষাকৃত মৃদু স্বরে) চিত্রার কাছে গিয়েছিলে? (চিত্রার নাম কানে যাইতেই রঞ্জন মুহূর্তের জন্য রায় ও অনিলেন্দুর দিকে দেখিয়া পুনরায় ছবিতে মন দিল! রায়ও রঞ্জনের উপস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন হইয়া অনিলেন্দুকে যতটা সম্ভব দূরে লইয়া গিয়া মৃদু স্বরে কথাবার্তা কহিতে আরম্ভ করিলেন।)

অনিলেন্দু। (রায়ের সঙ্গে যাইতে যাইতে) হ্যাঁ—আজ ভোরেই গিয়েছিলাম—গিয়ে তার একটা রসিকতাও হজম করে এলাম!

রায়। তার মানে?

অনিলেন্দু। (ফাইল হইতে একখানি ছবি বাহির করিয়া) সে আমাকে তার এই ছবিটা উপহার দিলে!

রায়। তা রসিকতাটা কোথায় করা হ'ল?

অনিলেন্দু। আজ তার জন্মদিনে আমি কোন উপহার নিয়ে

যাই নি—তার বদলে সেই আমাকে উপহার দিলে। দেবার সময়, একটু হেসে বললে—আমার জন্মদিনে এটা তোমায় দিলাম।

রায়। তোমার একটা ছবি তাকে দেওয়া হয়েছে?

অনিলেন্দু। সে তো আমার কাছ থেকে চায় নি—(ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া) আর কোনদিন চাইবেও না! যাক সে কথা—আজ সন্ধেবেলা তার বাড়িতে পার্টি—আপনার মনে আছে তো?

রায়। মনে আছে বই কি! আজ তার জন্মদিন। হ্যাঁ, আর একটা খবর তোমাকে দেবার আছে। আজ তোমার সম্বন্ধে সে তার শেষ সিদ্ধান্ত আমাদের জানাবে।

অনিলেন্দু। আজই? (মুখে ফুটিয়া উঠিল দুশ্চিন্তার আভাস)

রায়। হ্যাঁ—গতকাল সে আমাকে আর মহিমকে কথা দিয়েছে—আজই সে তার শেষ কথা জানাবে—আজই!

অনিলেন্দু। কিন্তু একটা কথা আপনারা ভুলে যাচ্ছেন। শেষ কথা বলব আমি—সে নয়!

রায়। (মৃদু অথচ ক্রুদ্ধ স্বরে) তার মানে? তুমি কি বলতে চাও?

অনিলেন্দু। (বাধা দিয়া) আমি বলতে চাই—শেষ কথা বলব আমি, সে নয়!

রায়। (অধিকতর ক্রুদ্ধ স্বরে) তার মানে? এতখানি এগিয়ে দিয়ে এখন তুমি আমাদের বিপদে ফেলতে চাও?

অনিলেন্দু। আপনি এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? আমি তো এখনও তাকে প্রত্যাখ্যান করি নি।

রায়। (রঞ্জনের উপস্থিতি ভুলিয়া গিয়া ক্রোধে প্রায় চীৎকার করিয়া উঠিলেন) তুমি প্রত্যাখ্যান করবে তাকে! তোমার স্পর্দ্ধা তো কম নয়! শোন—তুমি চিত্রাকে প্রত্যাখ্যান করবে কিনা এটা প্রশ্ন

নয়—প্রশ্ন, সে তোমাকে ফিরিয়ে দেবে কিনা! (রঞ্জনের কথা মনে পড়িল। দেখিলেন, সে তাঁহাদের দিকে তাকাইয়া আছে। লজ্জিত ও বিরক্ত হইয়া স্বর পূর্ববৎ নামাইয়া লইলেন) হ্যাঁ, ভাল কথা—তোমাদের বাড়ির খবর কি?

অনিলেন্দু। বাড়িতে সব ঠিক আছে।

রায়। (ক্রুদ্ধস্বরে) কি ঠিক আছে? কিচ্ছু ঠিক নেই! তোমার মা কাল আমাদের এখানে এসেছিলেন! চিত্রার ওপর তিনি মোটেই সন্তুষ্ট নন। আর তোমার বাবার কথা? তিনি তো মদের ঝোঁকে বলে বেড়াচ্ছেন—আমার চাপে পড়ে তুমি নাকি তোমার বিবেক বিক্রি করেছ! আমি তো ভেবে পাই না, চিত্রার সম্বন্ধে আপত্তির কি থাকতে পারে? সে মহিমের সঙ্গে—

অনিলেন্দু। (বাধা দিয়া) আমি তো বলেছি—বাড়ির সম্বন্ধে ভাববার কিছু নেই। বাবাকে তো আমি মানুষের মধ্যেই ধরি না। বাকী মা আর বিমলেন্দু। কাল আমি তাদের বলে দিয়েছি—বিয়ে করব আমি, কাজেই এ বিষয়ে তাদের মাথা ঘামাবার কোন প্রয়োজন নেই!

(স্কেচ শেষ করিয়া রঞ্জন রায়কে দেখাইতে আসিল। রঞ্জনকে আসিতে দেখিয়া অনিলেন্দু ছবিটিকে পুনরায় ফাইলের মধ্যে রাখিতেছিল। কিন্তু তাহার পূর্বেই রঞ্জনের দৃষ্টি পড়িল অনিলেন্দুর হাতের ঐ ছবির উপর।)

রঞ্জন। (অনিলেন্দুর হাতের উপর হাত রাখিয়া) চিত্রা দেবীর ছবি? (মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখিতে দেখিতে) সত্যিই সুন্দর! আনন্দ তাহলে মিথ্যে বলে নি তো!

রায়। (বিস্মিত হইয়া) চিত্রাকে আপনি চেনেন নাকি?

রঞ্জন। আমি আর আনন্দ একই ট্রেনে এসেছি। ট্রেনে আসতে

আসতে আনন্দর কাছ থেকে শুনেছি তাঁর কথা, তাঁর রূপের বর্ণনা—আপনাদের মুখে শুনলাম তাঁর নাম। তারপর এই ছবি দেখে মনে হ'ল—এ ছবি তাঁরই, আর কারো নয়!

রায়। (অনিলেন্দুকে) আনন্দ কে?

অনিলেন্দু। সম্প্রতি মারা গেলেন—ভুবনমোহন দাস—তাঁরই বড় ছেলে এই আনন্দ।

রায়। কোন্ ভুবন দাস? Das Industries-এর?

অনিলেন্দু। আজ্ঞে হ্যাঁ—আনন্দকে আপনি দেখেওছেন। সেই যে—সেবার চিত্রার জন্মদিনে এক জোড়া দামী হীরের দুল উপহার দিয়ে এসেছিল। ভুবনবাবু তো শুনে মহা খাপ্পা। আনন্দকে দিলেন বাড়ি থেকে তাড়িয়ে, তারপর সোজা চলে এলেন চিত্রার বাড়ি—সে প্রায় চিত্রার হাতে পায়ে ধরে দুল জোড়া ফেরত নিয়ে এলেন।

রায়। কিন্তু আমি তো শুনেছিলাম ভুবনবাবু তাঁর সমস্ত সম্পত্তি ছোট ছেলেকে দিয়ে গেছেন—

অনিলেন্দু। তাঁর সেই ইচ্ছেই ছিল—কিন্তু উইল করার সময় করে উঠতে পারেন নি।

রায়। (শঙ্কিত কণ্ঠস্বরে) তাহলে?

অনিলেন্দু। তাহলে আবার কি? আনন্দকে ভয় কিসের?

রঞ্জন। (অনিলেন্দুকে) আনন্দকে সম্প্রতি দেখেছেন আপনি?

অনিলেন্দু। আপনি তো দেখেছেন—দেখে কি মনে হ'ল আপনার?

রঞ্জন। আনন্দর অবস্থা প্রায় পাগলের মত। চিত্রা দেবীকে পাবার কামনা তার সমস্ত মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে!

অনিলেন্দু। (ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া) এখন দেখা যাক, চিত্রা দেবী কাকে কি ভাবে গ্রহণ করেন।

রায়। (ক্রুদ্ধ স্বরে) দেখ অনিলেন্দু—আমার মনে হচ্ছে, তুমি এখনও কিছু ঠিক করে উঠতে পার নি! তোমার যদি আপত্তি থাকে, তুমি আমাকে পরিষ্কার জানিয়ে দাও। এখনও সময় আছে। তুমি আমায় সোজাসুজি বল, চিত্রাকে বিয়ে করতে তোমার কোন আপত্তি আছে কিনা।

অনিলেন্দু। (এক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া) না আমার কোন আপত্তি নেই।

রায়। That's like a good boy! এতে আমার কিছু সুবিধে হবে না—সুবিধে হবে তোমারই!

রঞ্জন। (নিকটে আসিয়া) এই দেখুন—আপনার স্কেচটা।

রায়। (স্কেচটি হাতে লইয়া) বাঃ! ভারী সুন্দর এঁকেছেন তো!

রঞ্জন। (হাসিয়া) এটা কিন্তু আপনি বাড়িয়ে বলছেন। নিজের ছবি দেখে কেউ বলতে পারে না সেটা ভাল হয়েছে কি মন্দ হয়েছে।

রায়। না, না, সত্যিই স্কেচটা ভাল এঁকেছেন। আচ্ছা তাহলে এখন উঠি। আপনি অনিলেন্দুর সঙ্গে বাইরের ঘরে অপেক্ষা করুন। আমার স্ত্রী যদি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান, তাহলে আপনাকে ডেকে পাঠাব। (অনিলেন্দুকে) হঁ্যা ভাল কথা, তোমার বাড়িতে একখানা ঘর খালি আছে না? সেখানা এঁকে ভাড়া দাও না?

অনিলেন্দু। আমার কোন আপত্তি নেই। যদি ওঁর আপত্তি না থাকে—

রঞ্জন। না, না, আমার কিছু মাত্র আপত্তি নেই। বর্তমানে হোটেলে গিয়ে ওঠাও আমার পক্ষে শক্ত হ'ত। অবশ্য আনন্দ আমার একটা ব্যবস্থা করে দেবে বলেছিল—

রায়। আনন্দর মত লোকের সংস্রবে না আসাই আপনার পক্ষে ভাল (অনিলেন্দুকে) আচ্ছা অনিলেন্দু, তুমি এঁকে নিয়ে বাইরের ঘরে বসাও—আমি শঙ্করকে দিয়ে খবর পাঠিয়ে দিচ্ছি।

অনিলেন্দু। (রঞ্জনকে) আসুন রঞ্জন বাবু—

রঞ্জন। চলুন। (রায়কে হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া অনিলেন্দুর সঙ্গে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল)

[বাম দিকের দরজা দিয়া মিসেস রায় প্রবেশ করিলেন। মিসেস রায় সামান্য স্থূলাঙ্গী। পরিধানে সাদা খোলের চওড়া কালাপাড় শাড়ী। বয়স চল্লিশ পার হইলেও তিনি যে এককালে সুন্দরী ছিলেন, তাহার স্পষ্ট আভাস এখনও পাওয়া যায়। বয়স অনুযায়ী গাম্ভীর্যের ছাপ তাঁহার মুখে নাই। তাঁহার মুখ দেখিলে এবং তাঁহার সহিত কথা কহিলে বুঝা যায় তাঁহার মন কিশোরীর মতই সরল, সেখানে জটিলতার আভাস মাত্র নাই। একটু খামখেয়ালী—অল্পেই ধৈর্যচ্যুতি হয়, আবার অল্পেই শান্ত হইয়া পড়েন]

রায়। এই যে! আমি তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম—

মিসেস রায়। (রায়ের দিকে না চাহিয়া, গম্ভীরভাবে) কেন? কোন বিশেষ কাজে বাইরে যেতে হবে কি?

রায়। হ্যাঁ—মানে—কাজ ছিল একটা—

মিসেস রায়। কাজ তো যা ছিল, তা কালই হয়ে গেছে! মুক্তোর নেকলেস কেনাও হ'য়ে গেছে আর চিত্রাকে উপহার দেওয়াও হয়ে গেছে!

রায়। (ভীত স্বরে) তার মানে?

মিসেস রায়। (রায়ের দিকে চাহিয়া) মানে, খবর আমি সমস্তই রাখি! মহিমের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে আমি দেব না—তা সে মহিম লক্ষপতি ছেড়ে কোটিপতি হ'লেও না!

রায়। (ব্যাপারটিকে হাসিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়া) আরে! কোথায় কি তার নেই ঠিক, তুমি একেবারে বিয়ের কথায় চলে এলে! হ্যাঁ, ভাল কথা, তোমার দেশের একজন গ্রাম-সম্পর্কীয় আত্মীয় তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে—দেখা করবে কি?

মিসেস রায়। গ্রাম-সম্পর্কীয় আত্মীয়?

রায়। হ্যাঁ সেই যে—আমাদের ভৈরবদার ছেলে?

মিসেস রায়। তা সে যে কি একটা অসুখে ভুগছিল শুনেছিলাম?

রায়। হ্যাঁ—মানসিক জড়তা—মানে he was an idiot—মাঝে মাঝে মূর্ছাও যেত।

[বাম দিকের দরজা দিয়া সুমিত্রার প্রবেশ। সুমিত্রা অপূর্ব সুন্দরী, পরিধানে আসমানী রঙের জর্জেট, বয়স বাইশ।]

সুমিত্রা। কে idiot বাবা?

রায়। এই তোর মার সঙ্গে তাঁর একজন আত্মীয় দেখা করতে এসেছে—তার কথাই বলছি। মানে—he was an idiot—মানসিক জড়তা আর কি। এখন তাকে সম্পূর্ণ সুস্থ বললেই হয়।

সুমিত্রা। A true idiot! তুমি তাকে নিয়ে এস বাবা। চালাক লোক দেখে দেখে একঘেঁয়েমী এসে গেছে।

মিসেস রায়। কি পাগলের মত যা তা বকছিস! (রায়কে) এখানে এসে মূর্ছা-টুর্ছা যাবে না তো?

রায়। না, না, সে এখন সম্পূর্ণ সুস্থ, আর সে বেশ পড়াশুনাও করেছে। (সুমিত্রাকে) তাছাড়া তোর সঙ্গে মিলবেও ভাল। সে একজন আর্টিষ্ট—এই দেখ না, আমার মুখের একটা স্কেচ সে এঁকেছে (স্কেচটি সুমিত্রার হাতে দিলেন।)

[সুমিত্রা স্কেচটি দেখিয়া হাসিয়া উঠিয়া পরক্ষণেই গম্ভীর হইয়া পড়িল।]

রায়। কি রে হাসছিস কেন ?

সুমিত্রা। ছবিটা ভাল করে দেখেছ বাবা ? তোমার মুখের চেহারাটা ঠিক এঁকেছে, কিন্তু বুদ্ধির ছাপটা একেবারে বাদ পড়ে গেছে!

রায়। (হাসিয়া) নির্বোধ যে, সে নিজেকে ছাড়া দুনিয়াশুদ্ধ সকলকেই নির্বোধ ভাবে, মা।

সুমিত্রা। কিন্তু বাবা—এমনও হতে পারে, সে নির্বোধ নয়, ওটা তার একটা ভান! তুমি তাকে নিয়ে এস বাবা, আমরা তাকে দেখব। অদ্ভুত যোগাযোগ—artist and idiot—অদ্ভুত!

মিসেস রায়। তাহলে তোরাই কথাবার্তা বল, আমি চলি!

সুমিত্রা। না না, মা—আমি এই চুপ করলাম—আর একটি কথাও নয়। আমি বরং এখন থেকে হাসি চাপবার চেষ্টা করি, নইলে তাকে দেখেই হেসে ফেলব!

মিসেস রায়। (রায়কে) সে যখন চিঠি দিয়েছিল, তখন তোমাকে তার একটা উত্তর দিতে বলেছিলাম। দেওয়া হয়েছিল ?

রায়। না—মানে সময় করে উঠতে পারি নি।

মিসেস রায়। না—ইচ্ছে করে দাও নি ? যাক সে কথা, এখন তাকে ডেকে পাঠাও।

রায়। (দক্ষিণ দিকের দরজার নিকট গিয়া শঙ্করকে ডাকিলেন) (শঙ্কর আসিলে) শোন, মার দেশ থেকে এক ভদ্রলোক দেখা করতে এসেছেন। অনিলেন্দুবাবুর কাছে বসে আছেন, নাম রঞ্জনবাবু—তাঁকে এখানে নিয়ে আয়।

[শঙ্করের প্রস্থান]

মিসেস রায়। না বাপু—আমার কি রকম ভয় করছে! শেষকালে যদি একটা কিছু কাণ্ড-মাণ্ড বাধিয়ে বসে!

রায়। আরে না না, কিচ্ছু ভয় নেই—সে এখন সম্পূর্ণ সুস্থ বললেই হয়।

মিসেস রায়। তার মানে, সম্পূর্ণ সুস্থ হ'তে এখনও কিছুটা বাকী আছে?

রায়। না—মানে—তার কথাবার্তা একটু অদ্ভুত ধরনের; ঠিক আমাদের মত নয়। আমাদের সঙ্গে তার কোথায় যেন একটা অমিল রয়ে গেছে। কোথায়, তা আমি ঠিক বলতে পারব না। তবে একটা কথা আমার মনে হয়েছে। তার সঙ্গে যেটুকু কথাবার্তা আমার হয়েছে তাতে মনে হয়েছে, তার প্রকৃতি সরল—(দক্ষিণ দিকের দরজার দিকে চাহিয়া) এই যে উনি এসে গেছেন—(রঞ্জনের প্রবেশ) তাহলে তোমরা আলাপ কর। আমি এখন চলি, আমার একটু তাড়া আছে।

[রায় দক্ষিণ দিকের দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেলেন]

মিসেস রায়। (প্রস্থানোদ্যত রায়ের দিকে তাকাইয়া) তোমার তাড়া যে কেন, তা তো আমি জানি!

সুমিত্রা। (ভর্ৎসনার সুরে) আঃ মা!

মিসেস রায়। তুই চুপ কর সুমি! সব কথায় কথা ক'স নি। (রঞ্জনকে) তুমিই আমাদের ভৈরবদার ছেলে?

রঞ্জন। আজ্ঞে হ্যাঁ।

মিসেস রায়। (চেয়ার দেখাইয়া দিয়া) তা দাঁড়িয়ে রইলে কেন বাবা, বস। (রঞ্জন বসিলে, লজ্জিতভাবে) তোমার একখানা চিঠি আমরা পেয়েছিলাম, কিন্তু উত্তর দিয়ে উঠতে পারি নি। তার জন্যে মনে কিছু করো না বাবা—

রঞ্জন। (ব্যস্ত হইয়া) আজ্ঞে না না, মনে আমি কিছু করি নি।

সুমিত্রা। (এতক্ষণ ইজেলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ফ্রেমে আঁটা অর্ধ

সমাপ্ত ছবিটি দেখিতেছিল। রঞ্জনের কথা শুনিয়া মিসেস রায়ের কাছে আসিয়া রঞ্জনকে জিজ্ঞাসা করিল) কেন? মনে করেন নি কেন? মনে করারই তো কথা?

রঞ্জন। (মৃদু হাসিয়া) কারণ উত্তর আমি আশা করি নি। আমি জানি, ওঁর অবস্থায় পড়লে আমারও হয়ত উত্তর দেবার সময় হয়ে উঠত না।

সুমিত্রা। আপনার কথা শুনে তো আপনাকে নির্বোধ বলে মনে হয় না—

রঞ্জন। (মৃদু হাসিয়া) নির্বোধ তো আমি এখন নই—এককালে ছিলাম।

মিসেস রায়। আঃ সুমি—তুই বড় বাজে কথা বলিস! (রঞ্জনকে) আমার মেয়ের কথায় যেন কিছু মনে করো না বাবা। ওর কথা বলার ধরনই ঐ রকম—

রঞ্জন। আজ্ঞে না, মনে কিছু করি নি। ইডিয়ট কথাটা লোকে গালাগাল হিসেবেই ব্যবহার করে থাকে। সত্যি ইডিয়ট বড় একটা চোখে দেখা যায় না। কাজেই বরাত-জোরে এক-আধটা চোখে পড়লে, তার সম্বন্ধে কৌতূহল হওয়াটাই স্বাভাবিক।

[সুমিত্রা একবার মার দিকে ও আর একবার রঞ্জনের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি হানিয়া ইজেলের নিকট গিয়া অর্ধ-সমাপ্ত ছবিটিতে মনো-নিবেশ করিল।]

মিসেস রায়। তুমি কলকাতায় এসেছ কবে?

রঞ্জন। আজ সকালে এসে পৌঁছেছি—ট্রেন থেকে নেমে সোজা এখানেই আসছি।

মিসেস রায়। ও—তাহলে তো দেখছি সকাল থেকে তোমার কিছু খাওয়া হয় নি—(উঠিয়া শঙ্করকে ডাকিলেন। শঙ্কর আসিলে)

আমাদের চা এই ঘরেই নিয়ে এস, আর ঐ সঙ্গে ভাঁড়ার ঘরের মিট-সেফে সন্দেশ আছে—একটা প্লেটে সাজিয়ে নিয়ে এস। (ফিরিয়া আসিয়া বসিলেন) হ্যাঁ এইবার বল, আসলে তোমার অসুখটা কি হয়েছিল?

রঞ্জন। মানসিক জড়তা

মিসেস রায়। তার মানে?

রঞ্জন। মানে—খুব সাধারণ, সহজ বিষয় পর্যন্ত বোঝবার ক্ষমতা আমার ছিল না। কেউ কিছু জিগ্যেস করলে নির্বোধের মত চেয়ে থাকতুম। মূর্ছা হ'ত ঘন ঘন।

মিসেস রায়। তারপর?

রঞ্জন। তারপর ওয়াল্টেয়ারে ডক্টর আলির চিকিৎসায় ক্রমশ ভাল হয়ে উঠলাম। অবশ্য এখনও বোধহয় সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠতে পারি নি (শঙ্কর ট্রেতে করিয়া চা, সন্দেশ, টোষ্ট লইয়া প্রবেশ করিল।)

মিসেস রায়। সুমি, চা খেয়ে যা। (সুমিত্রা আসিয়া বসিলে, মিসেস রায় সকলকে চা খাবার পরিবেশন করিয়া দিলেন।)

রঞ্জন। আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ। সত্যিই আমার খুব খিদে পেয়েছিল।

মিসেস রায়। (স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া) এখানে এসে উঠেছ কোথায়?

রঞ্জন। মিষ্টার রায় সে ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। তিনি তাঁর অফিসে আমার একটা কাজ ঠিক করে দিয়েছেন, তাছাড়া অনিলেন্দু বাবুর বাড়িতে আমার থাকবারও একটা ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। তাঁকে ধন্যবাদ জানাবার মত ভাষা আমার নেই।

সুমিত্রা। আচ্ছা আপনি যে একটু আগে বললেন, আপনি এখনও বোধহয় সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠতে পারেন নি—

রঞ্জন। (বাধা দিয়া) কিছুদিন আগেও ওয়াল্টেয়ারে একদিন আমার মনে হয়েছিল আমি বড় অসুস্থ।

সুমিত্রা। (কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া) আপনার সে দিনের কথা মনে আছে?

রঞ্জন। পরিষ্কার মনে আছে। সেদিন বিকেলে বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। হঠাৎ একসময় মনে হ'ল, চারপাশে যা কিছু আছে সব অর্থহীন, কোন মানে হয় না এদের! ওই যে লোকটা ঠেলা-গাড়িটাকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে—ওটাই বা কেন হবে? গাড়িটা কেন ওই লোকটাকে ঠেলে নিয়ে যাবে না? আমার পথ চলা বন্ধ হয়ে গেল। মনে হ'ল ভেতর থেকে যেন একটা চাপা কান্না ঠেলে বেরিয়ে আসতে চেষ্টা করছে! হঠাৎ একটা গাধার ডাকে আমার চেতনা ফিরে এল।

মিসেস রায়। গাধা!

সুমিত্রা। (হাসি চাপিতে না পারিয়া) শেষ পর্যন্ত একটা গাধা! (সুমিত্রার মুখের দিকে তাকাইয়া রঞ্জনও হাসিতে আরম্ভ করিল।)

মিসেস রায়। (ভৎর্সনার সুরে) সুমি! এতে হাসবার কি আছে?

রঞ্জন। (হাসিতে হাসিতে) না না, আপনি রাগ করছেন কেন? ওঁর অবস্থায় পড়লে আমিও না হেসে থাকতে পারতুম না। (সুমিত্রাকে) কিন্তু আপনি যাই বলুন মিস রায়, আমি গাধার দিকে! ওরকম নিরীহ শান্ত জানোয়ার বড় একটা দেখা যায় না।

মিসেস রায়। তোমারও স্বভাবটি বড় শান্ত বাবা। (সুমিত্রা ও রঞ্জন আবার হাসিয়া উঠিল) এতে হাসির কি হ'ল? ও বুঝেছি—আবার সেই গাধা! (লজ্জিত স্বরে রঞ্জনকে) তুমি বিশ্বাস কর বাবা—আমি কোন কিছু ভেবে কথাটা বলি নি—

রঞ্জন। (হাসিতে হাসিতে) না না, আপনাকে অত ব্যস্ত হ’তে হবে না। আপনি যে সরল মনেই কথাটা বলেছেন, সেটুকু বোঝার মত বুদ্ধি আমার আছে।

মিসেস রায়। হ্যাঁ বাবা—আমার মনও তোমার মতই সরল। তবে আমার রাগটা একটু বেশী। তুমি যখন ঘরে ঢুকছিলে তখন আমি খুব রেগে ছিলাম। সুমিত্রা না ধমকালে, কি যে করে বসতুম তা বলা যায় না! তা যাকগে ওসব কথা—এখন তোমার কথা বল শুনি। ওয়াল্টেয়ারেই ছিলে বরাবর? ওখান থেকে বাইরে কোথাও যাওনি?

রঞ্জন। না বিশেষ কোথাও যাইনি। একবার শুধু ডক্টর আলির সঙ্গে চিল্কা হ্রদ দেখতে গিয়েছিলাম।

সুমিত্রা। কি রকম দেখলেন?

রঞ্জন। চিল্কা বড় সুন্দর। কিন্তু কি জানি কেন, চিল্কাকে দেখে মনে আনন্দের বদলে এসেছিল বিষাদ, কিসের একটা দুঃখ! হয়ত তখন আমি অসুস্থ ছিলাম, তাই।

সুমিত্রা। আপনি চিল্কার বর্ণনা করুন রঞ্জনবাবু—আমি তাই শুনে একটা ছবি আঁকব।

রঞ্জন। আমার কিন্তু মনে হয়, না দেখলে চিল্কার ছবি আঁকা যায় না।

সুমিত্রা। বেশ তাহলে দেখেই আসব। কিন্তু কি করে দেখতে হয় আপনি আমায় শিখিয়ে দেবেন তো!

রঞ্জন। (মৃদু হাসিয়া) শেখাবার মত বিদ্যে তো আমার জানা নেই মিস রায়। লেখাপড়া কিছু কিছু অবশ্য করেছি—তা দিয়ে শুধু এইটুকুই জানতে পেরেছি, এক সময় আমি ছিলাম নির্বোধ, জড়, এখন আর নই। আগে যেন কিসের একটা দুঃখ ছিল মনে।

এখন রোজ রাতে শুতে যাবার আগে মনে হয়, আমি বড় সুখী—রোজ সকালে ঘুম থেকে উঠে মনে হয় আগের দিনের চেয়ে অনেক বেশী আনন্দ রয়েছে মনে! আমি শুধু এইটুকুই জানি মিস রায়। পরকে শেখাবার মত কোন কিছুই আমার জানা নেই।

মিসেস রায়। জগতে যে যত কম চায় সেই তত সুখী বাবা—তোমারও বোধ হয় চাওয়ার ভাগটা খুবই কম!

রঞ্জন। হয়ত তাই—তবে আমি যখন অসুস্থ ছিলাম, তখন আমারও মন খুব চঞ্চল হয়ে উঠত। একদিন সমুদ্রের ধারে বসে থাকতে থাকতে মনে হ'ল যেন স্বপ্ন দেখছি। মনে হ'ল যেন আমি কলকাতায়। স্বপ্নে দেখলাম, কত বড় শহর এই কলকাতা, কত জিনিস এখানে, কত চাচ্ছি, কত পাচ্ছি। তারপর সুস্থ হওয়ার পর মনে হয়েছে মানুষ বন্দীশালাতে বাস করেও ইচ্ছে করলে সুখী হতে পারে, অতুল জীবন-সম্পদের অধিকারী হতে পারে!

সুমিত্রা। আপনি তো দেখছি একজন দার্শনিক।

রঞ্জন। (মৃদু হাসিয়া) কি জানি—হয়ত তাই! কিংবা হয়ত বা কিছুই বুঝি না, তাই এরকম মনে হয়।

সুমিত্রা। (বিরক্তি সহকারে) কিন্তু সকলের জীবন তো আপনার মত সুখের নাও হতে পারে?

রঞ্জন। (অল্প জোরের সহিত) কেন হবে না মিস রায়? দুঃখের মধ্যেও যেদিন বুঝব জীবনের কোন মুহূর্ত তুচ্ছ নয়, প্রতিটি মুহূর্ত বাঁচতে হবে, তখন তো বাঁচার জন্যে দুঃখটা বড় কথা নয়—তখন যে বাঁচাটাই সুখের। (কথা বলিতে বলিতে আত্মসমাহিত হইয়া গিয়াছিল, হঠাৎ মিসেস রায়ের দিকে দৃষ্টি পড়িতে) কিন্তু আপনাদের হয়ত এসব কথা ভাল লাগছে না—আপনারা হয়ত আমার ওপর রাগ করছেন?

মিসেস রায়। না না, রাগ করব কেন? বরং তোমার কথা শুনতে আমার বেশ ভালই লাগছে।

সুমিত্রা। (বিরক্তি সহকারে) আপনিই বা এত কিন্তু হচ্ছেন কেন? আপনি বলতে চান, আপনি আমাদের চেয়ে সুখী, আমাদের চেয়ে জীবনকে অনেক বেশী উপভোগ করেছেন—এই তো! কিন্তু জেনে রাখবেন, এর দ্বারা প্রমাণ হয় না, যে আপনি আমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। এর থেকে প্রমাণ হয়, আপনি শান্তিপ্রিয়, প্রতিবাদ করার ক্ষমতা আপনার নেই—আপনাকে না খেতে দিয়ে বসিয়ে রেখে কেউ যদি আপনার সামনে বুড়ো-আঙুলটা নেড়ে যায়, আপনি তা দেখেই সারা জীবনটা সুখে কাটিয়ে দিতে পারেন।

মিসেস রায়। (ভর্ৎসনার সুরে) তোর আজ কি হয়েছে বল দেখি সুমি? যত সব বাজে কথা! (রঞ্জনকে) তুমি কিছু মনে করো না বাবা রঞ্জন—ও তোমাকে রাগিয়ে মজা দেখছে।

রঞ্জন। (মৃদু হাসিয়া) আজ্ঞে তা নাও হতে পারে। তবে এটা ঠিক যে ওঁর বিরক্তিকর অবস্থাটা উনি নিজেই বেশ উপভোগ করছেন।

সুমিত্রা। আপনি কি করে জানলেন?

রঞ্জন। আপনার মুখ দেখে—

সুমিত্রা। আমার মুখ দেখে আপনি বলতে পারেন, আমি কি প্রকৃতির মেয়ে?

রঞ্জন। আপনি সুন্দর—সুন্দরের প্রকৃতি বিচার এত অল্প সময়ের আলাপে সম্ভব নয়।

সুমিত্রা। (হাসিয়া) তাহলে আমার সৌন্দর্যকে আপনি অস্বীকার করতে পারেন না দেখছি!

রঞ্জন। নিশ্চয় না—আপনার আর চিত্রা দেবীর মত সুন্দরী আমি খুব কমই দেখেছি।

সুমিত্রা ও মিসেস রায় (একসঙ্গে)। (বোধ হয় ভুল শুনিয়াছেন এই মনে করিয়া) কার মত ?

রঞ্জন। (সরলভাবে) চিত্রা দেবীর মত। অনিলেন্দুবাবু যে মিষ্টার রায়কে তাঁর ছবি দেখাচ্ছিলেন।

মিসেস রায়। (ক্রুদ্ধ স্বরে) এতদূর ! অনিলেন্দু তার কাছ থেকে একখানা ছবিও চেয়ে নিয়ে এসেছে !

রঞ্জন। (ব্যস্ত হইয়া) না না, চেয়ে নিয়ে আসেননি। আজ সকালে চিত্রা দেবী ছবিখানা অনিলেন্দুবাবুকে উপহার দিয়েছেন। তিনি ছবিটা মিষ্টার রায়কে দেখাবার জন্যেই নিয়ে এসেছিলেন।

মিসেস রায়। (ক্রোধে তাঁহার প্রায় কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতেছিল) আমি এখনি সে ছবি দেখতে চাই ! শঙ্কর ! শঙ্কর ! (শঙ্কর প্রবেশ করিলে) দেখ, অফিস কামরায় গিয়ে অনিলেন্দুবাবুকে বল, আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই—আর বলবে, সাহেবকে দেখাবার জন্যে তিনি যে ছবিটা নিয়ে এসেছেন, সেটাও যেন সঙ্গে করে নিয়ে আসেন। [শঙ্করের প্রস্থান]

রঞ্জন। (একবার সুমিত্রা, একবার মিসেস রায়ের মুখের দিকে দেখিয়া, অপ্রতিভভাবে) আমার যেন মনে হচ্ছে, আমি বড় অন্যায় করে ফেলেছি।

সুমিত্রা। সেটা নির্ভর করে আপনার প্রকৃতির ওপর। আপনার কথা শুনে মনে হয়—হয় আপনি অত্যন্ত ধূর্ত, আর না হয় আপনি অতি সরল আর সৎ প্রকৃতির লোক—মানে—চলতি দুনিয়া যাদের নির্বোধ বলে বাতিল করে দেয়, আপনি তাদেরই একজন। প্রথমটা যদি আপনার পক্ষে সত্যি হয়, তাহলে আপনি খুবই অন্যায় করেছেন ; আর দ্বিতীয়টা সত্যি হলে, আপনার পক্ষে যা স্বাভাবিক তাই করেছেন।

রঞ্জন। মানে—মানে—(কি যেন বলিতে যাইতেছিল, শঙ্করকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া থামিয়া গেল)।

শঙ্কর। অনিলেন্দুবাবু বললেন, তিনি এখনি আসছেন। আর সারদেশ্বরী আশ্রমের মা এসেছেন—তাঁকে ভেতরের ছোট ঘরে বসিয়েছি। তিনি আপনাদের দুজনের সঙ্গেই দেখা করতে চান—বললেন তাড়াতাড়ি চলে যাবেন, হাতে সময় খুব কম।

মিসেস রায়। আশ্রম থেকে মা এসে বসে রয়েছেন! চল তুমি আগে তাঁর সঙ্গে দেখা করে আসি। ভাল কথা বাবা রঞ্জন, অনিলেন্দু এলে আমার জন্যে অপেক্ষা করতে বলো—আমি এখনি আসছি। (শঙ্করের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বামদিকের দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেলেন)।

[দক্ষিণ দিকের দরজা দিয়া অনিলেন্দুর প্রবেশ, হাতে ফাইল।]

অনিলেন্দু। (ক্রুদ্ধ স্বরে) কেন আপনি বলতে গেলেন ছবির কথা? কি প্রয়োজন ছিল বলবার? নির্বোধ—Idiot!

রঞ্জন। (লজ্জিত ও অপ্রস্তুত ভাবে) আমি না ভেবে-চিন্তে অন্যায় করে ফেলেছি অনিলেন্দুবাবু—আপনি আমায় ক্ষমা করুন!—হঠাৎ মুখ দিয়ে কথাটা বেরিয়ে গেল—

অনিলেন্দু। (কণ্ঠস্বর অপেক্ষাকৃত নামাইয়া) কি বলেছেন আপনি?

রঞ্জন। আমি শুধু বলেছি মিস রায় আর চিত্রা দেবীর মত সুন্দরী আমি খুব কমই দেখেছি—তারপরই ছবির কথাটা এসে পড়ল।

অনিলেন্দু। (ক্রুদ্ধ স্বরে) কি প্রয়োজন ছিল চিত্রার নাম করবার! আজ সকাল থেকেই দেখছি চিত্রা নামটা আপনার মাথার মধ্যে ঘুরছে—কেন বলতে পারেন? (আরও কি যেন বলিতে যাইতেছিল—হঠাৎ কি মনে করিয়া শান্ত হইয়া পড়িল। নিকটে আসিয়া) আপনি আমায় মাফ করবেন রঞ্জনবাবু—আমি রাগ সামলাতে পারি নি—

রঞ্জন। (উঠিয়া) না না, দোষ তো আমারই—আপনার রাগ হওয়া কিছু অন্যায় নয়।

অনিলেন্দু। (কুণ্ঠিত স্বরে) রঞ্জন বাবু—মানে—আপনি যদি দয়া করে—

রঞ্জন। আপনি অত কুণ্ঠিত হচ্ছেন কেন? আমি তো বলছি, আপনার রাগ হওয়া কিছু অন্যায় নয়।

অনিলেন্দু। না, মানে যে ভাবে অন্যায় গালি-গালাজ আমি করেছি—এরপর আমার আর বলতে সাহস হচ্ছে না।

রঞ্জন। না না, সে কি কথা! ও গালি-গালাজটা তো আমার ন্যায্য প্রাপ্য—আপনি নির্ভয়ে বলুন, কি বলতে চান!

অনিলেন্দু। আপনি যদি দয়া করে আমার একটা উপকার করেন—

রঞ্জন। (উৎসাহের সহিত) বলুন কি করতে হবে? আমার সাধ্যায়ত্ত হলে নিশ্চয় করব!

অনিলেন্দু। (পকেট হইতে ভাঁজ করা চিঠি বাহির করিয়া) আপনি যদি দয়া করে এই চিঠিটা মিস রায়ের হাতে পৌঁছে দেন—অবশ্য মিস রায় যখন একা থাকবেন।—(রঞ্জনকে দেখিয়া মনে হইল সে যেন স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে)—মানে আমি এটা নিজেই দেব বলে এনেছিলাম; কিন্তু ওঁরা আমার ওপর বড় রেগে রয়েছেন, বেশীক্ষণ আমার উপস্থিতি ওঁরা সহ্য করতে পারবেন না। মিস রায়কেও একা পাওয়ার সুয়োগ হয়ত হবে না—আপনার হ'লেও হ'তে পারে।—(রঞ্জনের দুটি হাত ধরিয়া) রঞ্জনবাবু এ কাজটুকু আপনাকে করতেই হবে—না বললে আমি শুনব না! এই চিঠির উত্তরের ওপর আমার সব কিছু নির্ভর করছে—বলুন আপনি রাজী আছেন—বলুন রঞ্জনবাবু! বলুন—(কণ্ঠস্বর কাঁপিতে লাগিল)

রঞ্জন। (পত্র গ্রহণ করিয়া, গম্ভীর স্বরে) আমি এটা নিচ্ছি—কিন্তু জানবেন, অনিচ্ছাসত্ত্বেও এ কাজ আমাকে করতে হচ্ছে—

অনিলেন্দু। (যেন রঞ্জনের কথা শুনিতে পায় নাই) আপনি যে আমার কি উপকার করলেন রঞ্জনবাবু! আপনাকে না পেলে হয়ত এ চিঠি আর মিস রায়ের হাতে পৌঁছত না!—(রঞ্জনের হাত ধরিয়া) রঞ্জনবাবু, এ চিঠি মিস রায়ের পাওয়া চাই—যে করে হ'ক এটা আপনাকে করতেই হবে!

রঞ্জন। (পূর্ব্ববৎ গম্ভীর স্বরে) আমি যখন এটা হাতে করে নিয়েছি, তখন জানবেন যেমন করে পারি আমি এটা মিস রায়ের হাতে পৌঁছে দেব।

অনিলেন্দু। কিন্তু দেখবেন, আর কারো নজরে যেন না পড়ে—

রঞ্জন। আমি অন্য কাউকে দেব না, এ বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

অনিলেন্দু (কুণ্ঠিত স্বরে) চিঠিটা কিন্তু খোলা—

রঞ্জন। আপনার ভয় নেই—আমি এ চিঠি পড়ব না।

[বাম দিকের দরজা দিয়া সুমিত্রার প্রবেশ। সুমিত্রাকে দেখামাত্রই অনিলেন্দু রঞ্জনের নিকট হইতে সরিয়া আসিল। সরিয়া আসিবার পূর্ব্বে রঞ্জনকে অস্ফুটস্বরে বলিয়া গেল—"রঞ্জনবাবু, মিস রায় একা।"]

রঞ্জন। (সুমিত্রার হাতে চিঠি দিয়া মৃদু অথচ গম্ভীর স্বরে) অনিলেন্দু বাবু দিয়েছেন। এটার ওপর তাঁর সব কিছু নির্ভর করছে।

[সুমিত্রার দৃষ্টিতে ফুটিয়া উঠিল বিস্ময় আর ক্রোধ। অনিলেন্দু কি যেন বলিতে যাইতেছিল। এমন সময় মিসেস রায়ের প্রবেশ। সমস্ত ব্যাপারটি কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ঘটিয়া গেল।]

মিসেস রায়। (অনিলেন্দুকে) ছবি এনেছ? (অনিলেন্দুর

হাত হইতে ছবিটি গ্রহণ করিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত ধরিয়া নিবিষ্ট চিত্তে দেখিলেন) হ্যাঁ, সুন্দর একথা স্বীকার করতেই হবে—অপূর্ব্ব সুন্দরী ! (হঠাৎ রঞ্জনের দিকে মুখ তুলিয়া) কিন্তু দেহের সৌন্দর্যই কি সব ? মন কুৎসিত হলেও ?

রঞ্জন। মন কুৎসিত কিনা জানি না—তবে ও সৌন্দর্য মনকে অভিভূত করে দেয়।

মিসেস রায়। কিন্তু কেন ?

রঞ্জন। (মুখ দেখিয়া মনে হইল, সে যেন নিজেকেই বলিতেছে) কি গভীর দুঃখ লুকিয়ে আছে ঐ মুখের আড়ালে—হয়ত অশুদ্ধতা আছে—কিন্তু দুঃখ সে অশুদ্ধতাকে পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে।

মিসেস রায়। (ক্রুদ্ধ স্বরে) এ তুমি নির্বোধের মত কথা বলছ রঞ্জন ! তুমি ভুলে যাচ্ছ, তুমি এখনো তাকে চোখে পর্যন্ত দেখনি ! (ছবিটি অনিলেন্দুকে ফেরত দিলেন।)

সুমিত্রা। (প্রস্থানোদ্যত) তুমি ভুলে যাচ্ছ মা, নির্বুদ্ধিতা এখনও মাঝে মাঝে ওঁর মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। (রঞ্জনকে ইজেলের অর্ধ-সমাপ্ত ছবিটি দেখাইয়া) আপনি চলে যাবেন না যেন রঞ্জনবাবু। আপনার সঙ্গে এই ছবিটা নিয়ে আমার দু-একটা কথা আলোচনা করবার আছে।

[সুমিত্রার প্রস্থান]

মিসেস রায়। এই যে অনিলেন্দু, তোমাকে আমার কটা কথা জিজ্ঞেস করবার আছে—আশা করি উত্তর পাব।

রঞ্জন। আমি বরং তাহলে এখন আসি—

মিসেস রায়। না না, আমার প্রশ্নের মধ্যে গোপনীয় এমন কিছু নেই, যা তোমার সামনে জিজ্ঞেস করা যায় না। সমাজে অবিশ্যি গোপনীয়তা রক্ষা করাই চলিত রীতি—কিন্তু সে রীতি

আমি মানি না। আমার মনে কোন প্রশ্ন উঠলে তা আমি খোলাখুলি জিজ্ঞেস করি। জানো রঞ্জন, আমার পরিচিত-গোষ্ঠীর মধ্যে যাদের আমি স্নেহ করি, তাদেরই কজনের বিয়ের কথাবার্তা চলছে। কিন্তু কথাবার্তা চলছে আড়ালে আড়ালে—যেন এসবের মধ্যে কি একটা গোপন পাপ লুকিয়ে আছে—(উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে) কি সে পাপ, কিসের জন্যে এই গোপনীয়তা, তা আমি জানতে চাই! (হঠাৎ অনিলেন্দুর দিকে ফিরিয়া) অনিলেন্দু. তুমি নাকি বিয়ে করছ?

অনিলেন্দু। (শুষ্ক কণ্ঠস্বরে) না—মানে—না তো—

মিসেস রায়। না! বেশ মনে থাকে যেন অনিলেন্দু, আমার এই প্রশ্নের উত্তরে তুমি না বলেছ। (রঞ্জনকে) আচ্ছা তাহলে আজ আমি উঠি রঞ্জন, তুমি সময় পেলেই আবার এস। (সুমিত্রাকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া) কি রে সুমি, আশ্রমে যাবি না?

সুমিত্রা। তুমি তৈরী হয়ে নাও মা—আমি এখনি আসছি। রঞ্জনবাবুর কাছ থেকে ছবি সম্বন্ধে দু-একটা কথা জেনে নেব।

[মিসেস রায়ের প্রস্থান]

অনিলেন্দু। (মৃদু অথচ আবেগ-ব্যাকুল কণ্ঠস্বরে) সুমিত্রা!

সুমিত্রা। (যেন শুনিতেই পায় নাই) রঞ্জনবাবু, একটু আগে যে চিঠি আমি আপনার হাত থেকে পেয়েছি, তাতে কি লেখা আছে আপনি জানেন?

রঞ্জন। না, সে চিঠি তো আমি পড়ি নি।

সুমিত্র। ও—পড়েন নি? তাহলে শুনুন, কি লেখা ছিল তাতে—(রঞ্জনকে কোন কথা বলিবার অবকাশ না দিয়া, পত্রের ভাঁজ খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল)—"আজ আমার ভাগ্য নির্ধারিত হইবে। চিত্রাকে বিবাহ করিতে সম্মত আছি কি না, সে সম্বন্ধে শেষ কথা বলিবার দিন আজই। তোমার সহানুভূতি আবার ফিরিয়া

পাইব, এরূপ কল্পনা করিবার সাহস আমার নাই। তোমাকে পাইবার আশা আমার কোনদিন ছিল না। কিন্তু কিছুকাল পূর্বে তোমার মুখের একটি কথা প্রদীপ্ত দীপশিখার ন্যায় আমার অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবনকে আলোকিত করিয়া তুলিয়াছিল আজ আমি ঐরূপ একটি কথার প্রতীক্ষায় আছি। সামান্য ইঙ্গিত মাত্রই আমার পক্ষে যথেষ্ট হইবে। তাহাই দারিদ্র্যকে আমার নিকট সহনীয় করিয়া তুলিবে—মধ্যবিত্ত জীবনের সমস্ত ধিক্কার, লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া সারাজীবন তোমার প্রতীক্ষায় থাকিবার সামর্থ আনিয়া দিবে। এ পত্র হয়ত ঔদ্ধত্য বলিয়া মনে হইতে পারে; কিন্তু অনিবার্য ধ্বংসের সম্মুখীন ব্যক্তির নিকট হইতে ইহা আসিতেছে এইরূপ মনে করিয়া পত্রলেখককে মার্জনা করিও।"

—অনিলেন্দু

সুমিত্রা। (পত্র হইতে মুখ তুলিয়া) যে লোকের কাছ থেকে এ চিঠি এসেছে, সে আমার মুখের একটি মাত্র কথা পেলেই আমার জন্যে সারাজীবন অপেক্ষা করতে পারে। কিন্তু একদিন তার প্রেম আমাকে জয় করে নিতে পারে এ বিশ্বাস তার নেই। তাই তার প্রয়োজন, আমার মুখের কথার। আমার মুখের কথা পেলে তবে সে তার দশ হাজার টাকা দামের বিয়ের সম্বন্ধে না বলে আসতে পারে—তার আগে নয়। কিন্তু সে যদি আমার কথা না পেয়েই ওখানে না বলে আসতে পারত তাহলে সে আমাকে পেত তার বান্ধবী রূপে—আর হয়ত বা কোনদিন তার স্বপ্নও সত্য হয়ে উঠত। তাছাড়া সে মিথ্যাবাদী। ইঙ্গিতপূর্ণ কোন কথাই আমি তাকে কোনদিন বলি নি। একদিন তার অবস্থা দেখে দয়া হয়েছিল, তার জীবনের আশা-আকাঙ্খা সম্বন্ধে দু-একটা কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম মাত্র—আমার কথার মধ্যে তার ওপর নিছক করুণা ছাড়া আর কোন

ইঙ্গিতই ছিল না। যাক—আর বেশী কথার প্রয়োজন নেই—এ চিঠি তাকে ফেরত দিয়ে দেবেন। (পত্র রঞ্জনের হাতে দিল)

রঞ্জন। (পত্র গ্রহণ করিয়া) লিখে উত্তর দেবার প্রয়োজন নেই বলে মনে করেন ?

সুমিত্রা। (কঠিন স্বরে) লেখা উত্তর পাবার যোগ্যতা থাকা চাই—সে যোগ্যতা তার নেই ! আচ্ছা তাহলে আজ উঠি রঞ্জনবাবু—মা আবার অপেক্ষা করছেন। সময় হলে আসবেন, ছবি সম্বন্ধে অলোচনা করা যাবে—আচ্ছা, নমস্কার—(নমস্কার করিয়া বাম দিকের দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেল। তাহার ভঙ্গী দেখিয়া মনে হইতেছিল ঘরে যেন আর কেহ নাই)।

অনিলেন্দু। (ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত কণ্ঠে) এ আপনার কাজ। আপনি নিশ্চয় আমার নামে এদের কাছে কুৎসা করেছেন। কি বলছেন বলুন—

রঞ্জন। (সহজ কণ্ঠস্বরে) আপনার নামে কোন কথাই আমি বলি নি। শুধু একবার চিত্রা দেবীর নাম উল্লেখ করেছিলাম—তাইতেই ছবির কথা এসে পড়ে—

অনিলেন্দু। (ক্রোধকম্পিত স্বরে) তা হ'তে পারে না ! আমার সঙ্গে মিস্টার রায়ের কথাবার্তা আপনার কানে গেছে—সে সব কথা আপনি এঁদের কাছে বলেছেন।

রঞ্জন। আপনি ভুল করছেন। আপানার কথাবার্তার অতি অল্প অংশই আমার কানে এসেছে। আমি সে সময় ছবি আঁকতে ব্যস্ত ছিলাম। যেটুকু কানে এসেছিল, সেটুকুও আমি এদের কাছে বলি নি। আমার পরিষ্কার মনে আছে।

অনিলেন্দু। (মুখ বিকৃত করিয়া) আমার পরিষ্কার মনে আছে ! কিচ্ছু মনে নেই আপনার, মনে থাকতে পারে না ! Dont forget

that you are an idiot. আপনি নির্বোধ, কি বলতে কি বলেছেন তা আপনার মনে থাকতেই পারে না।

রঞ্জন। না—আমি কিছু বলি নি।

অনিলেন্দু। না, বলেন নি! তা না হলে এ কি করে সম্ভব হয়! বলুন—আপনিই বলুন? আমার দিকে তিনি ফিরেও তাকালেন না, আর আপনার মত একটা নির্বোধকে বিশ্বাস করে ব্যক্তিগত ব্যাপার আলোচনা করে গেলেন!

রঞ্জন। (গম্ভীর অথচ শান্ত কণ্ঠস্বরে) অনিলেন্দুবাবু আপনার হিসেবে এক জায়গায় ভুল হচ্ছে; সংশোধন করতে বাধ্য হচ্ছি। অতীতে আমি পীড়িত ছিলাম, তখন একটা মানসিক জড়তা আমার বোধশক্তিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। কিন্তু এখন আমি সম্পূর্ণ রোগমুক্ত—আর রোগমুক্ত বলেই আপনার দেওয়া নির্বোধ আখ্যা আমি গ্রহণ করতে পারছি না—প্রতিবাদ করতে বাধ্য হচ্ছি।

অনিলেন্দু। (লজ্জিত কণ্ঠস্বরে) আপনি আমায় ক্ষমা করুন রঞ্জনবাবু, রাগে আমি মাথার ঠিক রাখতে পারি নি—

রঞ্জন। আপনার দুর্ভাগ্যের কথা ভেবে, প্রথমবার আমি আপনাকে ক্ষমা করেছিলাম। কিন্তু পরমুহূর্তে আপনি আবার আমায় নির্বোধ বললেন—আপনি ভুলে গেলেন, আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় মাত্র অল্প ক'ঘণ্টার।

অনিলেন্দু। (হাত জোড় করিয়া) আপনি আমায় ক্ষমা করুন রঞ্জন-বাবু—আমার মনের অবস্থার কথা চিন্তা করেও আমাকে ক্ষমা করুন।

রঞ্জন। না না, অত ক্ষমা চাইবার মত কিছু হয় নি। আমি আপনার ভুল দেখিয়ে দিচ্ছিলাম মাত্র। তবে আমার মনে হয়, আপনার মনের এ অবস্থায় আপনি আমাকে সহ্য করতে পারবেন না—কাজেই আমাদের পথ ভিন্নমুখী হ'ক।

অনিলেন্দু। (ব্যস্ত হইয়া) না না, তা যদি করেন, তাহলে বুঝব আপনি আমার ওপর রাগ করে আছেন।

রঞ্জন। (মৃদু হাসিয়া) আমি আপনার ওপর রাগ কোন সময়েই করি নি—ওটা আপনার বোঝবার ভুল। আপনার অসুবিধে হবে ভেবেই কথাটা আমি বলেছি—নইলে, আপনার বাড়ি গিয়ে উঠতে আমার নিজের তরফ থেকে কোন আপত্তিই নেই। চলুন, যাওয়া যাক্। (রঞ্জন ও অনিলেন্দু দক্ষিণ দিকের দরজার দিকে অগ্রসর হইতেছিল। কিন্তু চিত্রা ও মহিমকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। চিত্রা অপূর্ব সুন্দরী, এরূপ সৌন্দর্য্য বড় একটা চোখে পড়ে না। বয়স চব্বিশ, সাজ-সজ্জায় বাহুল্য একেবারেই নাই। মহিমের বয়স প্রায় আটত্রিশ, পরিধানে কোঁচানো ধুতি ও পাঞ্জাবি, সুপুরুষ। বর্তমানে তাহাকে অত্যন্ত ব্যাকুল ও শঙ্কিত দেখাইতেছিল।)

রঞ্জন। (চিত্রা ঘরে প্রবেশ করিবামাত্রই) চিত্রা দেবী!

অনিলেন্দু। (ভয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া) চিত্রা, তুমি এখানে?

মহিম। (ব্যাকুল স্বরে) চিত্রা, ফিরে চল, লক্ষীটি।

চিত্রা। (অনিলেন্দু ও মহিমের কথায় কান না দিয়াই রঞ্জনকে ক্রুদ্ধস্বরে) হ্যাঁ চিত্রা দেবী—যাও, তোমার মা-জীকে খবর দাও আমি দেখা করতে এসেছি—

অনিলেন্দু। চিত্রা, উনি এ পরিবারের একজন আত্মীয়!

মহিম। (পূর্ববৎ ব্যাকুল স্বরে) চিত্রা লক্ষীটি আমার কথা শোন, ফিরে চল—

চিত্রা। (রঞ্জনকে, বিস্মিত দৃষ্টিতে) তুমি—মানে—আপ নি এঁদের আত্মীয়! মাফ করবেন—আমি আন্দাজ করতে পারি নি।

রঞ্জন। (মৃদু হাসিয়া) না না, এতে আপনার লজ্জা পাবার মত কিছু নেই। এ পরিবেশের মধ্যে আমাকে চাকর বলে মনে হওয়াই স্বাভাবিক।

চিত্রা। কোন কিছুর জন্যে লজ্জা পাওয়া আমার স্বভাব নয়। কিন্তু আপনি আমার—

মহিম। (চিত্রাকে কথা শেষ করিতে না দিয়া, হাত ধরিয়া) চিত্রা, লক্ষ্মীটি ফিরে চল। অতীতে সামান্য হলেও তোমার উপকার আমি করেছিলাম—সে কথা মনে করেও—

চিত্রা। (হাত ছাড়াইয়া লইয়া ক্রুদ্ধস্বরে) উপকার! উপকারের কথা মুখে আনতে তোমার লজ্জা করে না মহিম? বাবা মা যখন মারা গেলেন তখন ন'বছর বয়স আমার—আমাকে তুমি আশ্রয় দিয়েছিলে। গভর্ণেস রেখে লেখা-পড়াও শিখিয়েছিলে। কিন্তু কিসের আশায়? তোমার সঙ্গে আমার দ্বিতীয় সাক্ষাৎ হয়, আশ্রয় পাবার আটবছর পর। কিন্তু কোথায়, কখন—সে কথা তোমার মনে আছে মহিম?

মহিম। (ব্যাকুল স্বরে) ওকথা বলা আমার ভুল হয়ে গেছে—আমি তোমার কাছে মাফ চাইছি চিত্রা—এখন আমার কথা শোন—এখান থেকে চল—

চিত্রা। (হতবাক অনিলেন্দুর দিকে দেখিয়া) কি অনিলেন্দু—তোমার মুখের ভাব তো এরকম হবার কথা নয়! তুমি তো সব জেনে শুনেই আমাকে বিয়ে করছ। তাই না মহিম? অনিলেন্দুকে বল নি তুমি—তোমার আমার দ্বিতীয় সাক্ষাৎ হয়েছিল রাত্রে, কলকাতায়—তোমার শোবার ঘরে—বল নি তুমি?

মহিম। (লজ্জায় তাহার মুখ রক্তিম হইয়া উঠিয়াছে) অনিলেন্দু সব জানে চিত্রা—সব জেনে-শুনেই সে তোমাকে—

অনিলেন্দু। (বাধা দিয়া) মানে—আমি বলছিলাম কি—তোমার এখানে আসার তো কোন প্রয়োজন ছিল না—

চিত্রা। প্রয়োজন নেই কে বললে—নিশ্চয় আছে! আজ বাদে কাল তোমাকে বিয়ে করতে হবে—তোমাকে শেষ কথা দিতে হবে! তার আগে একবার যাচাই করে দেখব না, তুমি যে সমাজে চলা-ফেরা কর, সে সমাজে আমার অভ্যর্থনাটা কেমন হয়?

অনিলেন্দু। না—মানে—আমি বলছিলাম, তুমি আমার ওখানে চল—আমি সকলের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি।

চিত্রা। কেন, এখানে পরিচয় করিয়ে দিতে তোমার লজ্জা হয়—না অনিলেন্দু? তোমার মত নির্লজ্জেরও লজ্জা আছে তাহলে? আশ্চর্য! (বাম দিকের দরজা দিয়া বাহিরে যাইবার জন্য সুসজ্জিতা হইয়া মিসেস রায় ও সুমিত্রার প্রবেশ।)

মিসেস রায়। শঙ্কর ওপরে গিয়ে খবর দিলে, কে যেন দেখা করতে এসেছেন—কিন্তু এখন তো আমার—(চিত্রাকে দেখিয়াই থামিয়া গেলেন)—তুমি—মানে—আপনি?

চিত্রা। আমি চিত্রা।

মিসেস রায়। তা তো দেখতেই পাচ্ছি—কিন্তু এখানে কেন?

চিত্রা। জানেন না—অনিলেন্দুবাবুর ভাবী পত্নী আমি! অনিলেন্দুবাবুর পরিচিত আপনারা—তাই তো আপনাদের সঙ্গে আলাপ করতে এলাম—

সুমিত্রা। (গম্ভীর স্বরে) কিন্তু অনিলেন্দুবাবুকে আমরা পরিচিতের মধ্যে গণ্য করি না। উনি আমার বাবার বেতনভোগী কর্মচারী।

চিত্রা। কিন্তু আপনার বাবা? তাঁকে তো আপনি পরিচিতের মধ্যে গণ্য করেন? মনে করুন যদি বলি—

মিসেস রায়। (কঠোর কণ্ঠে) চুপ করুন! (সুমিত্রার দিকে ফিরিয়া) তুমি এখন এঘর থেকে যাও তো মা—আর শোন, গাড়ী বার করতে বারণ করে দাও—এখন আশ্রমে যাওয়া হবে না। (সুমিত্রা চলিয়া গেলে) এইবার বলুন কি বলছিলেন?

চিত্রা। এখনও বলবার প্রয়োজন আছে?

মিসেস রায়। না নেই। আমি জানি আমার স্বামীর সঙ্গে আপনি বিশেষভাবে পরিচিতা। কিন্তু তিনি এখন বাড়ীতে নেই।

চিত্রা। তা না থাকতে পারেন—কিন্তু আমি এখানে এসে কিছু অন্যায় করি নি। তিনিই আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।

মিসেস রায়, মহিম ও অনিলেন্দু। (এক সঙ্গে) তার মানে?

চিত্রা। এই তো পরশু, রাত তখন প্রায় এগারটা। আমি রায়কে জিজ্ঞেস করলাম—"নিজের সুবিধের জন্যে অনিলেন্দুর সঙ্গে আমার বিয়ে তো দিচ্ছ, কিন্তু তারপর অনিলেন্দুর সমাজ যদি আমাকে গ্রহণ না করে, তখন?" উত্তরে রায় বললেন—"নিশ্চয় গ্রহণ করবে। বিশ্বাস না হয় অনিলেন্দুর বাড়ি গিয়ে দেখতে পার—তাতেও যদি বিশ্বাস না হয়, একদিন আমার অনুপস্থিতিতে আমার বাড়ি গিয়ে দেখতে পার।"

রঞ্জন। (এতক্ষণ নির্বাক হইয়া দেখিতেছিল, হঠাৎ বলিয়া উঠিল) কিন্তু কোনদিন আপনি এখানে আসতে চেষ্টা করবেন না, এই ভেবেই মিষ্টার রায় আপনাকে ও কথা বলেছিলেন—তাই নয় কি চিত্রা দেবী?

মিসেস রায়। (ধমকের স্বরে) রঞ্জন!

অনিলেন্দু। What an idiot!

চিত্রা। কিন্তু ওঁর কথা শুনে তো তোমার চেয়ে ওঁকে বেশী বুদ্ধিমান বলে মনে হচ্ছে।

রঞ্জন। (মৃদু হাসিয়া) আজ্ঞে উনি ঠিকই বলেছেন—তবে সময়টা গোলমাল করে ফেলেছেন।

চিত্রা। (বিস্মিত দৃষ্টিতে) তার মানে ?

রঞ্জন। এক সময়ে আমি নির্বোধ ছিলাম, কিন্তু এখন নই।

চিত্রা। বুঝলাম না—

রঞ্জন। একটা জড় মন নিয়ে আমি বেড়ে উঠেছিলাম—কিন্তু চিকিৎসায় সে জড়তা থেকে আমার মন এখন মুক্তি পেয়েছে।

চিত্রা। ও বুঝেছি—Once you were an idiot—কিন্তু আপনি আমার নাম জানলেন কি করে ?

রঞ্জন। আনন্দর কাছ থেকে। আবার অনিলেন্দুবাবুর কাছে আজ সকালে আপনার ছবি দেখেছি—

চিত্রা। কিন্তু ও ছবি তো অনেকদিন আগেকার তোলা। ওই ছবিটা একবার দেখেই আপনি আমায় চিনে ফেললেন ?

রঞ্জন। ঠিক তা নয়। আনন্দর কাছ থেকে আপনার কথা শোনার পর আপনার একটা রূপ আমি কল্পনা করে নিয়েছিলাম। আপনি ঘরে ঢোকা মাত্রই মনে হ'ল, কল্পনার সেই আপনি আর বাস্তবের এই আপনি, এর মধ্যে কোন পার্থক্যই নেই—আরও মনে হ'ল—

চিত্রা। আর কি মনে হ'ল।

রঞ্জন। (তাহার কণ্ঠস্বর আবেগপূর্ণ। দেখিয়া মনে হইতেছিল, সে চিত্রা ছাড়া আর সকলের অস্তিত্ব ভুলিয়া গিয়াছে—মুখে চোখে একটা আচ্ছন্নের ভাব।) মনে হ'ল, এ মুখ আমি যেন কোথায় দেখেছি—কোথায় যেন দেখেছি—কোথায় ? সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে পড়ছে—মনে এতটুকু আনন্দ নেই—সামনে, পেছনে, জমাট হয়ে রয়েছে অন্ধকার—অন্ধকার নয়, গভীর দুঃখ—তার মাঝে দেখা

যাচ্ছে আপনার মুখ—কি গভীর দুঃখের ছায়া পড়েছে সে মুখে—কিংবা, হয়ত কোনদিন স্বপ্নে দেখেছিলাম আপনাকে—(হঠাৎ বাস্তব অবস্থা মনে পড়িয়া যাইতে, শঙ্কিত ও অপ্রস্তুত কণ্ঠস্বরে)—না না, এসব আমি কি আবোল তাবোল বকছি—মানে—আমি আপনাকে কোনদিন দেখি নি—কি করে দেখব আমি আপনাকে— আমি এই প্রথম এখানে আসছি—আপনি আমায় মাফ করবেন মানে—

মিসেস রায়। (এতক্ষণ বিস্মিত দৃষ্টিতে রঞ্জনকে দেখিতেছিলেন, এখন ক্রুদ্ধস্বরে) মানে কিছু নয়—মানে তুমি চুপ কর। নির্বোধের মত আবোল তাবোল বকে চলেছ, আবার ঘটা করে বলা হয় এক সময় আমি নির্বোধ ছিলাম! (মহিমকে) আপনি আমার স্বামীর পরিচিত, আর সেই পরিচয়ের সূত্রে আপনি এখানে আসেন। আমাদের রুচি আপনি জানেন, আমাদের নীতিবোধের সঙ্গে আপনি পরিচিত—কাজেই আপনাকে বলে লজ্জা দেবার মত কিছু নেই—

মহিম। (অতিমাত্রায় লজ্জিত হইয়া) বিশ্বাস করুন মিসেস রায়, আজকের এ ঘটনার জন্যে আমি আন্তরিক লজ্জিত।

মিসেস রায়। (চিত্রাকে) আমি জানতাম না, আমার স্বামী আপনাকে আমন্ত্রণ করেছেন। আমি আমার পূর্বকৃত ব্যবহারের জন্য ক্ষমা চাইছি।

চিত্রা। কেন মিথ্যে সৌজন্য প্রকাশ করতে গিয়ে কষ্ট পাচ্ছেন? যখন জানেন, মন থেকে ক্ষমা করতে পারবেন না—

মিসেস রায়। (কঠিন স্বরে) তা করবার প্রয়োজনও বোধ করি না।

চিত্রা। আমিও অবিশ্যি আপনার ক্ষমা পাবার অপেক্ষায় কিছু বসে নেই। (মিসেস রায়ের মুখভঙ্গী আরও কঠোর হইয়া উঠিল। তিনি কি যেন বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় রায়ের প্রবেশ)

রায়। (প্রবেশ করিতে করিতে) ব্যাপার কি? গোলমাল কিসের? (চিত্রার দিকে দৃষ্টি পড়িতে স্তম্ভিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া গেলেন) চিত্রা! মহিম!

মহিম। বিশ্বাস করুন মিষ্টার রায়, আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি বাধা দেবার—কিন্তু কোন ফল হয় নি

চিত্রা। মাইরি বলছি রায়—আপনি একবার "বেরোও" বললে আর এক মিনিটও এখানে দাঁড়াব না।

রায়। (কণ্ঠস্বর যতদুর সম্ভব সহজ করিবার চেষ্টা করিয়া) না না, সে কি কথা—আমিই তো তোমাকে আসতে বলেছিলাম—(মিসেস রায়ের দিকে ফিরিয়া) এস তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিই।

মিসেস রায়। (কঠোর কণ্ঠস্বরে) থাক, তার আর দরকার হবে না—আমাদের পরিচয় আগেই হয়ে গেছে।

চিত্রা। (ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া) উনি বোধ হয় আপনার মুখ থেকে আমার পরিচয় শুনতে রাজী নন!

মিষ্টার রায়। (হাসিবার চেষ্টা করিয়া, মিসেস রায়কে) তুমি বোধ হয় চিত্রার নতুন পরিচয় জান না। ওর সঙ্গে যে আমাদের অনিলেন্দুর—

মিসেস রায়। (বাধা দিয়া, পূর্ব্ববৎ কঠোর কণ্ঠস্বরে) থাক—সে খবরও আমি পেয়েছি।

চিত্রা। কিন্তু একটা কথা ভুলে যাচ্ছেন রায়—এখনও আমি শেষ কথা দিই নি। (মিসেস রায়ের দিকে ফিরিয়া ব্যঙ্গের হাসি হাসিতে হাসিতে) আর সেই জন্যেই তো এখানে আসা। মহিম আর রায় কি জানি কেন একেবারে উঠে পড়ে লেগেছেন, অনিলেন্দুকে আমার হাতে গছিয়ে দেবার জন্যে। তাই তো এখানে চলে এলাম, আপনাদের পরামর্শ নিয়ে ব্যাপারটার একটা মীমাংসা করব বলে।

(বাম দিকের দরজা দিয়া অনিলেন্দুর ভাই বিমলেন্দুর প্রবেশ)

মিসেস রায়। বিমলেন্দু!

বিমলেন্দু। হ্যাঁ মাসীমা—সুমিত্রাদির সঙ্গে দেখা করতে এসে পাশের ঘরে দাঁড়িয়ে সব শুনছিলাম—সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেল, তাই দাদাকে নিয়ে যেতে এলাম—

চিত্রা। বাঃ অনিলেন্দু—তোমার ছোট ভাইটি বেশ ভবিষ্যবুক্ত দেখছি!

বিমলেন্দু। বাড়ি চল দাদা—

অনিলেন্দু। (ক্রোধ-কম্পিত স্বরে) বিমল!

বিমলেন্দু। তোমার চোখ রাঙানো-তে আমি ভয় পাব না দাদা! এখানে থেকে আর কেলেঙ্কারি বাড়িও না—বাড়ি চল—

অনিলেন্দু। তুই এখান থেকে যাবি কি না?

মিসেস রায়। আমিও বলছি বিমল, তোর এখানে না থাকাই ভাল—

বিমলেন্দু। সে কথা আমিও জানি, কিন্তু দাদাকে না নিয়ে আমি তো যাব না মাসীমা।

(দক্ষিণ দিকের দরজা দিয়ে আনন্দ ও কৃপানাথের প্রবেশ। আনন্দ রঞ্জনের বয়সী, দীর্ঘ বলিষ্ঠ আকৃতি। তাহাকে দেখিয়া মনে হইতেছিল, কি এক উদগ্র কামনা যেন তাহার মন, প্রাণ আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। তাহার পরিধানে ঢিলা পাজামা ও পাঞ্জাবি। কৃপানাথের বয়স পঁয়ত্রিশও হইতে পারে পঁয়তাল্লিশও হইতে পারে। তাহাকে দেখিয়া মনে হইতেছিল লোকটি অত্যন্ত ধূর্ত। ইহা ছাড়া তাহার আকৃতি বা পরিচ্ছদে বর্ণনা করিবার মত বৈশিষ্ট্য কিছুই ছিল না।)

আনন্দ। (প্রবেশ করিতে করিতে) আমাকেও আসতে হ'ল,

চিত্রাকে নিয়ে যেতে—(ঘরে প্রবেশ করিয়া, রঞ্জনের দিকে দৃষ্টি পড়িতে) আরে রঞ্জন যে! একেবারে রেলের পোশাকেই এখানে এসে উঠেছ দেখছি! তা তোমায় যে আমার ওখানে যেতে বলে-ছিলাম বন্ধু?

রঞ্জন। তোমার ওখানে আর ওঠা হল না আনন্দ, এখানেই চলে এলাম আগে—

চিত্রা। এস এস আনন্দ—তুমি ওঁকে চেন নাকি?

আনন্দ। হ্যাঁ, ওয়াল্টেয়ারে আমাদের আলাপ, আমরা একই ট্রেনে কলকাতায় ফিরেছি। ওঁর পরিচয় বড় অদ্ভুত! এক সময়ে উনি ছিলেন নির্বোধ, কিন্তু বর্তমানে একজন শিল্পী, দার্শনিক, কবিও বলতে পার। কি বল রঞ্জন, এবার আর নিশ্চয় tense এর ভুল হয় নি?

রঞ্জন। (মৃদু হাসিয়া) Tense-এর গোলমাল তোমার তো হয় না আনন্দ, তোমার গোলমাল হয় mood-এর।

রায়। (ক্রুদ্ধ ও বিস্মিত কণ্ঠস্বরে) তোমরা—মানে—আপনারা?

আনন্দ। (বাধা দিয়া) আমি আনন্দ দাস—সম্প্রতি পিতার মৃত্যুতে বিপুল বিত্তের অধিকারী হয়েছি।

মিসেস রায়। কিন্তু আমরা আপনাকে চিনি না—আপনি এখানে এসেছেন কেন?

আনন্দ। কেন, আমি তো প্রবেশ-পত্র আগেই পাঠিয়ে দিয়েছি! সে প্রবেশ পত্র গৃহীতও হয়েছে, অনুমোদিতও হয়েছে।

মিসেস রায়। তার মানে?

চিত্রা। (মৃদু হাসিয়া) আনন্দ আমার কথা বলছে মিসেস রায়।

মিসেস রায়। ঠিক বুঝলাম না।

কৃপানাথ। তার মানে, চিত্রা দেবী যেখানে থাকেন, সেখানে আনন্দ দাসের আসা বা থাকা সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না।

আনন্দ। অর্থাৎ মানুষের সঙ্গে যেমন তার ছায়া ফেরে, তেমনি চিত্রার সঙ্গে ছায়ার মত ফেরে আনন্দ।

মিসেস রায়। তা হলে দেখছি পুলিসে খবর দেওয়া ছাড়া আর কোন উপায়ই নেই!

আনন্দ। তবে মিস্টার রায়কে জিজ্ঞেস করে পুলিসে খবরটা দিলেই ভাল হয়—মিস্টার রায় আবার চিত্রা সম্বন্ধে একটু—(মিসেস রায় মিষ্টার রায়ের দিকে চাহিলেন)।

রায়। না—মানে—আমি বলছিলাম কি, ব্যাপারটার একটা ভদ্র ভাবে মীমাংসা করে নিলেই তো গোল চুকে যায়—

মিসেস রায়। থাক—আর বলতে হবে না, বুঝেছি।

আনন্দ। দরকার কি এসব গোলমালে চিত্রা, চল আমরা এখান থেকে যাই—

অনিলেন্দু। (ক্রুদ্ধ স্বরে) এটা ভদ্রলোকের বাড়ি!

আনন্দ। (অনিলেন্দুর দিকে না ফিরিয়া) ওহে কৃপানাথ, কথাটা কে বলছেন দেখ তো, কোন ভদ্রলোক নাকি?

কৃপানাথ। কথাটা বললেন অনিলেন্দুবাবু—

আনন্দ। তা হলে ও কথা নিয়ে ভাববার কিছু নেই—অনিলেন্দু ভদ্রলোক নয়।

অনিলেন্দু। (আনন্দর দিকে অগ্রসর হইয়া আসিয়া) You Rascal!

আনন্দ। (ঘৃণা ভরা কণ্ঠস্বরে) আর তুমি কি জান? তুমি কুকুর। মাস কয়েক আগে যখন ব্যাঙ্ক থেকে তোলা বাবার দশ হাজার টাকা নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম, তখন তুমি ঠিক কুকুরের মত

আমার পিছু পিছু ঘুরেছিলে। (চিত্রাকে) শুনলাম তুমি নাকি অনিলেন্দুকে বিয়ে করবে—আজ শেষ কথা দেবার জন্যেই তুমি নাকি এখানে এসেছ? তুমি জান না চিত্রা, অনিলেন্দু মানুষ নয়, কুকুর। পাঁচটা হ'ক, দশটা হ'ক, কটা টাকা গড়িয়ে দাও—দেখবে কুকুরের মত ও তার পিছু পিছু চলেছে—

অনিলেন্দু। রাস্কেল। তোমাকে আমি এমন শিক্ষা দেব—

রায়। (অনিলেন্দুকে আনন্দর দিকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া শঙ্কিত কণ্ঠস্বরে) অনিলেন্দু!

আনন্দ। কিছু ভাববেন না, আমার কাছে আসবার মত সাহস ওর নেই। ও মনে মনে জানে, আমি ওকে যে কথা বলেছি, তা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। ওই দেখুন, ওই দেখ চিত্রা অনিলেন্দুকে—দেওয়াল ধরে দাঁড়িয়ে কাঁপছে—(আকুল কণ্ঠস্বরে) সত্যি! সত্যি চিত্রা তুমি অনিলেন্দুকে বিয়ে করবে?—সত্যি তুমি আজ শেষ কথা দেবার জন্যে এখানে এসেছ?

চিত্রা। (রায় ও মহিমের দিকে দেখিয়া) কক্ষনো না—কে বললে তোমাকে এসব বাজে কথা?

আনন্দ। কি বললে? কক্ষনো না! (অধীর আনন্দে উন্মত্তের ন্যায়) না! না! বাজে কথা! চিত্রা—সত্যি বিশ্বাস কর—শুনে অবধি আমার মাথার ঠিক ছিল না! না না, অনিলেন্দুর জন্যে তুমি ভেবো না—টাকা পেলে অনিলেন্দু বাসর ঘরে বসে বউকে বেচে দিতে পারে। (অনিলেন্দুকে) বল অনিলেন্দু—কত টাকা পেলে তুমি পথ থেকে সরে দাঁড়াবে—হাজার—দু'হাজার—তিন হাজার—

অনিলেন্দু। (রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে) অসভ্য—মাতাল!

আনন্দ। (পূর্ববৎ উত্তেজিত অবস্থায়) মাতাল আমি মোটেই নই—আমি সজ্ঞানেই কথা বলছি—(পকেট হইতে একটি প্যাকেট

বাহির করিয়া) চিত্রা, এই নাও, এতে পাঁচ হাজার আছে—অনিলেন্দুর কাছে যদি তোমার কোন বাধ্য-বাধকতা থাকে এ টাকাই তার পক্ষে যথেষ্ট হবে।

চিত্রা। (ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া) তোমার স্পর্ধা তো কম নয় আনন্দ।

আনন্দ। কেন? কি হল?

চিত্রা। মোটে পাঁচ হাজার! এই হল আমার দাম!

আনন্দ। (উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায়) ঠিক বলেছ চিত্রা, আমার বড় ভুল হয়ে গেছে। সত্যিই আমার কোন আন্দাজ নেই, তুমিই বল চিত্রা, কত হতে পারে? সাত হাজার? (উন্মত্তের ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে) আট হাজার? না না, দশ হাজার বল চিত্রা, বল দশ হাজার—চিত্রা—দশ হাজার—

চিত্রা। (মৃদু হাসিতে হাসিতে) ধর যদি বলি তাই।

আনন্দ। তাই হবে চিত্রা, তাই হবে। কৃপানাথ, তুমি এখানেই থাক—রতন শেঠের দেওয়া পাঁচ হাজার টাকা আমার বাড়িতেই আছে—তুমি যেন ব্যস্ত হয়ে পড়ো না চিত্রা—আমি টাকা নিয়ে এখনি আসছি, জেন আমি যাব আর আসব—

[প্রস্থানোদ্যত]

কৃপানাথ। তুমি কি পাগল হয়ে গেলে আনন্দ?

আনন্দ। পাগল আমি নই, তুমি! চিত্রার দিকে কখনো ভাল করে তাকিয়ে দেখেছ? ও কি রূপ? ও যে আগুন! (ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতে যাইতে) ও আগুনে আমায় পুড়ে মরতেই হবে—পুড়ে মরতেই হবে—(বাহির হইতে তাহার কণ্ঠস্বর শোনা যাইতে লাগিল) তুমি এখানেই থেক চিত্রা—জেন আমি এখুনি আসব—আমি নিশ্চয়ই আসব—

মিসেস রায়। (রায়কে) এ সবের অর্থ কি বলতে পার ?

বিমলেন্দু। আপনারাই বা এসব সহ্য করছেন কেন মাসীমা ? (চিত্রাকে দেখাইয়া) যত নষ্টের মূল তো ওই—ওটাকে ঘাড় ধরে বার করে দিলেই তো গোল চুকে যায় !

চিত্রা। দেখুন মিষ্টার রায়, দেখ মহিম—শ্বশুরবাড়ি অনিলেন্দুর ভাবী পত্নীর অভ্যর্থনাটা কি রকম হবে একবার দেখ !

রায়। বিমলকে বাড়ি যেতে বললেই ভাল করতে অনিলেন্দু—

বিমলেন্দু। বাড়ি আমি যাচ্ছি—কিন্তু তুমি কি দাদা ? ওটাকে বিয়ে করব বলে কথা দেবার আগে তোমার গলায় একগাছা দড়ি জুটল না ?

অনিলেন্দু। (বিমলেন্দুর নিকট গিয়া, ক্রুদ্ধস্বরে) তুই চুপ করবি কি না ?

বিমলেন্দু। (ক্রুদ্ধস্বরে) চুপ আমি করব না ! তোমার লজ্জা করে না দাদা ! ভেবে দেখ দেখি, তুমি কোথায় নেমেছ, আর আমাদেরও কোথায় নামিয়েছ। ছিঃ ! ছিঃ !

অনিলেন্দু। চুপ কর হতভাগা—যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা—(সজোরে বিমলেন্দুকে চপেটাঘাত করিল)

রঞ্জন। (ছুটিয়া আসিয়া অনিলেন্দুকে ধরিল) অনেক হয়েছে ! লজ্জা আর বাড়াবেন না অনিলেন্দুবাবু—এদিকে আসুন—

অনিলেন্দু। (এক ঝটকায় নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়া) নির্বোধ ! idiot ! সকাল থেকে শনির মত তুমি আমার পেছনে লেগে রয়েছ—(উন্মত্তের ন্যায় রঞ্জনকে সজোরে চপেটাঘাত)

মিসেস রায়। (বিমলেন্দুকে সরাইয়া লইতেছিলেন) কি সর্বনাশ !

রায়। তুমি ক্ষেপে গেলে নাকি অনিলেন্দু ?

চিত্রা। ছিঃ অনিলেন্দু !

রঞ্জন। আমাকে যত খুশি আপনি মারতে পারেন অনিলেন্দুবাবু—তবু যে অন্যায় অপনি করেছেন, তা আমি আপনাকে আর করতে দেব না। (কণ্ঠস্বর অশ্রু ভারাক্রান্ত হইয়া আসিল)

চিত্রা। ছিঃ অনিলেন্দু! আহা বেচারা কেঁদেই ফেললে—

মিসেস রায়। (অনিলেন্দুকে) ছিঃ ছিঃ! (রঞ্জনের দিকে অগ্রসর হইয়া) তুমি চলে এস বাবা রঞ্জন, এ ঘর থেকে চলে এস—

রঞ্জন। (শান্ত স্বরে) না না, আপনি ব্যস্ত হবেন না। আমার নিজের জন্যে কষ্ট হচ্ছে না, আমার কষ্ট হচ্ছে অনিলেন্দুবাবুর কথা ভেবে। আজকের অপরাধের লজ্জা একদিন ওঁকে পেতেই হবে—সে যে কি লজ্জা—কি ভীষণ কষ্ট—(হঠাৎ চিত্রার দিকে ফিরিয়া) আর আপনি? আপনার লজ্জা হচ্ছে না, কষ্ট হচ্ছে না আপনার?

চিত্রা। লজ্জা? কষ্ট? আমার?

রঞ্জন। হ্যাঁ আপনার! আপনি তো এরকম নন! কেন মিথ্যে ভান করছেন? কি প্রয়োজন এই মিথ্যের? (যেন আর সকলের অস্তিত্ব ভুলিয়া গিয়াছে) তোমাকে আমি জানি—কি গভীর দুঃখ রয়েছে ঐ চোখের নীচে—তবে কেন এই রূঢ়তার ভান?

চিত্রা। (আত্মস্থ হইয়া) ঠিক বলেছ—বড় দুঃখ—বড় কষ্ট—তবে কেন এই মিথ্যে ভান—(হঠাৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া) না না, কে বললে মিথ্যে—সব সত্যি—(রঞ্জনকে) আপনাকে যে লোকে নির্বোধ বলে, তা দেখছি মিথ্যে বলে না—

[মিসেস রায় বিমলেন্দুকে লইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন]

রঞ্জন। হয়ত লোকে যা বলে তাই সত্যি—হয়ত আমি নির্বোধ। কিন্তু আপনাকে চিনতে আমার এতটুকু ভুল হয়নি। দুঃখ আপনার মনকে পুড়িয়ে খাঁটি সোনা করে রেখেছে—সে মনকে আমি ঠিক চিনেছি! তবে কেন এই কুৎসিত ভান? কত যুগ যুগান্তরের পরিচয়

আমাদের, তুমি আর আমি কতদিনের চেনা-পরিচয়! (হঠাৎ পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে সচেতন হইয়া দেখিল সকলেই বিস্মিত দৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইয়া আছে। লজ্জিত কণ্ঠস্বরে) না না, ঠিক বলেছেন সত্যিই আমি নির্বোধ। আমি কি বলতে কি বলে ফেলেছি, আপনি আমায় ক্ষমা করবেন।

চিত্রা। (হাসিয়া উঠিয়া) না না, দোহাই আপনার! ক্ষমা আপনি চাইবেন না! ওতে আপনার চরিত্রের মৌলিকত্বটুকু নষ্ট হয়ে যাবে—আপনাকে আর অদ্ভুত, আশ্চর্য লোক বলে মনে হবে না। যদিও আপনি আমায় ঠিক চিনতে পারেন নি, তবুও—

রঞ্জন। (বাধা দিয়া) ও কথাটা আমি স্বীকার করি না।

চিত্রা। ও, তাহলে আপনি বলতে চান আপনি আমায় ঠিক চিনেছেন?

রঞ্জন। নিশ্চয়।

চিত্রা। কিন্তু আজ এখানেই প্রমাণ হয়ে যাবে, আপনি কতবড় ভুল ধারণা করেছেন আমার সম্বন্ধে।

রায়। (অল্প ইতস্ততঃ করিয়া) আমার মনে হয়, প্রমাণটা আর একদিন হলেই ভাল হ'ত।

মহিম। আমারও তাই মনে হয়। আজ তাহলে এখানেই আসর ভাঙ্গা যাক, কি বলেন মিস্টার রায়?

রায়। হ্যাঁ—মানে—

চিত্রা। কিন্তু তা কি করে হবে। আনন্দ যে আমাকে এখানেই অপেক্ষা করতে বলে গেছে।

অনিলেন্দু। (বিকৃত মুখভঙ্গী করিয়া, ক্রুদ্ধস্বরে) আনন্দ অপেক্ষা করতে বলে গেছে! আনন্দর বলে যাওয়ার কোন দাম আছে নাকি? একটা মাতাল, চরিত্রহীন!

চিত্রা। (ব্যঙ্গ মিশ্রিত স্বরে) হয়ত তাই! তবু কি জান অনিলেন্দু? কু হ'ক, সু হ'ক, ওর তবু চরিত্র বলে একটা পদার্থ আছে। কিন্তু তুমি, রায়, মহিম, তোমাদের চরিত্র বলে কোন পদার্থ নেই! এই মহিমের কথাই ধর না—

কৃপানাথ। (বাধা দিয়া)। থাক, থাক, চিত্রা—আর বলতে হবে না—ওঁরা আনন্দ আসা অবধি অপেক্ষা করতে রাজী আছেন—তাই না মিষ্টার রায়?

রায়। তোমার মত বেয়াদবের কোন প্রশ্নের উত্তর আমি দিই না!

কৃপানাথ। দেখ, দেখ, চিত্রা—ভদ্রলোককে যে আপনি বলতে হয়, সে কথাটা পর্যন্ত মিষ্টার রায় ভুলে গেছেন।

চিত্রা। (হাসিয়া) ভদ্রলোক? কে? তুমি? কবে থেকে হলে?

কৃপানাথ। তোমার কাছে আমি চিরদিন ছোটলোক হয়ে থাকতেই রাজী। কিন্তু এঁদের তুলনায় আমি বোধহয় ভদ্রলোক।

চিত্রা। প্রমাণ?

কৃপানাথ। এঁদের জীবনের জঘন্যতম পাপের সঙ্গে আমার জীবনের জঘন্যতম পাপ মিলিয়ে দেখা হ'ক—তাহলেই প্রমাণ পাওয়া যাবে।

চিত্রা। তাই নাকি! আচ্ছা বল, শুনি তাহলে তোমার জীবনের জঘন্যতম পাপ কি?

কৃপানাথ। বলতে পারি, এক শর্তে—এঁরাও যদি এঁদের পাপের কথা নিজমুখে ব্যক্ত করেন।

চিত্রা। বলবেন বই কি! নিশ্চয় বলবেন। বলবে না রায়? তাহলে কিন্তু তোমার দেওয়া হীরের নেকলেস, আমি মিসেস রায়কে—

রায়। (বাধা-দিয়া) না না, অত করে অনুরোধ না করলেও

চলবে। বলব বই কি, নিশ্চয় বলব! তোমার যখন অনুরোধ—কি বল মহিম?

মহিম। আমারও কোন আপত্তি নেই।

চিত্রা। তোমার যে আপত্তি থাকবে না, তা আমি জানতাম।

মহিম। কি করে জানলে?

চিত্রা। (মৃদু হাসিয়া) তোমার সঙ্গে আমার দ্বিতীয় সাক্ষাতের পর থেকে, আজ সাত বছর আমি তোমার কোন কথায় আপত্তি করি নি। এমন কি অনিলেন্দুর সঙ্গে বিয়েতেও না। কি বল অনিলেন্দু? থাকগে ওসব কথা—কৃপানাথ, তুমি আরম্ভ কর তোমার গল্প।

কৃপানাথ। গল্প বলার আগে, আমি একটা প্রশ্ন করব। কিন্তু করিই বা কাকে? (হঠাৎ রঞ্জনের দিকে ফিরিয়া) আচ্ছা আপনার কি মনে হয় না রঞ্জনবাবু, দুনিয়ায় চোর নয় যারা তাদের চেয়ে চোরের সংখ্যা অনেক বেশী? জীবনে একবারও চুরি করে নি, এমন লোক আছে বলে আমার তো মনে হয় না। আপনি কি বলেন রঞ্জনবাবু?

রায়। এরকম নির্বোধের মত কথা বলার কোন মানে হয়!

কৃপানাথ। আপনার কাছে হয়ত হয় না—কিন্তু রঞ্জনবাবুর কাছে হয়! কি বলেন রঞ্জনবাবু?

রঞ্জন। (মৃদুস্বরে) আপনার কথার মধ্যে অতিশয়োক্তি আছে অনেকখানি, কিন্তু কথাটাকে একেবারে মিথ্যে বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

কৃপানাথ। বাস্ বাস্ তাহলেই হবে! আচ্ছা এবার আমার গল্প শুনুন—কিছুদিন আগে এক বাড়ীতে আমার চায়ের নেমন্তন্ন ছিল। আমি যখন গিয়ে পৌঁছলুম, তখনো অন্য কেউ আসে নি। কর্তা আমাকে ঘরে বসিয়ে কি একটা কাজে ভেতরের দিকে চলে গেলেন। একা বসে বসে এদিক-ওদিক দেখছি হঠাৎ দেখি একটা

গোল টেবিলের ওপর তিনখানা দশটাকার নোট চাপা দেওয়া রয়েছে। কি মনে হ'ল—নোট তিনখানা পকেটে পুরে নিলাম—

চিত্রা। তারপর?

কৃপানাথ। কর্তার হুঁশ হ'ল, যখন চায়ের আসর শেষ তখন। সন্দেহ গিয়ে পড়ল তাঁদের বাড়িতে আশ্রিতা একটি মেয়ের ওপর। সকলের সঙ্গে আমিও তাকে জেরা করলাম। তারপর সেখান থেকে বেরিয়ে এসে, বারে ঢুকে সে টাকাটা উড়িয়ে দিলাম।

চিত্রা। মেয়েটির কি হ'ল?

কৃপানাথ। মেয়েটিকে তারা তারপর দিনই তাড়িয়ে দিল—

চিত্রা। (ঘৃণা ভরা কণ্ঠস্বরে) আর তুমি সব জেনেও চুপ করে রইলে?

কৃপানাথ। (ক্রুদ্ধ স্বরে) চুপ করে থাকব না তো কি গিয়ে বলব, আমিই চুরি করেছি—

চিত্রা। কৃপানাথ, তুমি জানোয়ারেরও অধম!

কৃপানাথ। (ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে) মানুষ যখন খারাপ কাজ করে, তখন সে কিছু মহামানব থাকে না! এখানে যে কজন বসে আছেন, সকলের মধ্যেই তুমি ঐ জানোয়ারটাকে খুঁজে পাবে!

চিত্রা। (দুই হাতে কান চাপিয়া ধরিয়া) কৃপানাথ! তোমার কথা আর আমি শুনতে পারছি না—তুমি চুপ কর!

কৃপানাথ। (পূর্ববৎ ক্রুদ্ধ স্বরে) কেন, চুপ করব শুনি? এ শর্মা কাউকে ভয় করে কথা বলে না।

চিত্রা। হ্যাঁ—ভয় তুমি কর। কাকে জান? আনন্দকে। তুমি যদি চুপ না কর, আনন্দ এলে বলে দেব, তোমাকে যেন শঙ্কর মাছের চাবুক মেরে চুপ করিয়ে দেয়! (মহিমের দিকে ফিরিয়া) এবার তোমার পালা মহিম, আরম্ভ কর—

মহিম। একান্তই বলতে হবে আমাকে!

চিত্রা। নিশ্চয়।

মহিম। তাহলে শোন—আজ থেকে প্রায় ষোল সতের বছর আগেকার কথা। কোন একটা কাজে আমাকে দিন পাঁচেকের জন্যে রাণাঘাট যেতে হয়েছিল। সেখানেই—

চিত্রা। (উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে) তুমি মিথ্যে কথা বলছ মহিম!

মহিম। তার মানে?

চিত্রা। ঘটনাটা ঘটেছিল আজ থেকে সাত বছর আগে কোন এক রাতে, তোমার কলকাতার বাড়ির শোবার ঘরে—

মহিম। (চিত্রার কথা গ্রাহ্য না করিয়া, ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে) সেদিন একটা বিয়ে বাড়িতে যাবার কথা ছিল। সেখান থেকে ফিরে আসার পর—

চিত্রা। (ক্রোধে ও উত্তেজনায় তাহার সর্বাঙ্গ কাঁপিতেছে) মিথ্যে কথা! ঘটনার মূল অঙ্কুরিত হয়েছিল, আজ থেকে পনর বছর আগে। যখন তুমি এক বাপ মা মরা মেয়েকে আশ্রয় দিয়ে, গভর্নেস রেখে পড়িয়ে শুনিয়ে, তার চোখের সামনে এক রঙ্গিন পৃথিবীর স্বপ্ন তুলে ধরেছিলে—

মহিম। (ক্রোধে উত্তেজনায় দাঁড়াইয়া উঠিল) চিত্রা, তোমার স্পর্ধা সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে! বাঁ হাতের কাল দাগটার কথা ভুলে যেও না—

চিত্রা। মোটেই ভুলি নি। মাত্র এক রাত্রি তোমার উপভোগের সামগ্রী হতে চাই নি বলে তুমি আমায় চাবকেছিলে। রায় তোমার লক্ষ টাকার সম্পত্তি দেখে সমস্ত ভুলে গিয়ে, তোমায় মেয়ে দিতে রাজী হতে পারে, আমি কিন্তু ভুলি নি। উপভোগে যখন তোমার বিরক্তি এসে গিয়েছিল, তখন তুমি আমাকে আর পাঁচজনের হাতে তুলে দিতে

দ্বিধা বোধ কর নি—(ব্যঙ্গের সুরে) তবে হ্যাঁ, নিজের কুকর্মের খেসারাত হিসাবে একটা মোটা টাকার মাসোহারার বন্দোবস্ত করতে ভোলো নি! কৃপানাথ, তুমি ঠিকই বলেছ—এ জানোয়ারেরও অধম!

মহিম। (চিত্রার দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতে আসিতে, ক্রুদ্ধ স্বরে) তুমি থামবে কি না? (উত্তেজনাবশে মহিম একটা কিছু করিয়া বসিতে পারে এই ভাবিয়া রায়)—"আঃ কি হচ্ছে মহিম! তুমিও কি ক্ষেপে গেলে নাকি?" এই বলিতে বলিতে মহিমের দিকে অগ্রসর হইয়া আসিলেন। ইতিমধ্যে দেখা গেল রঞ্জন চিত্রা ও মহিমের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।)

রঞ্জন। (ধীর, শান্ত কণ্ঠস্বরে) আপনি স্থির হয়ে বসুন মহিমবাবু—(মহিম হয়ত রঞ্জনকে ঠেলিয়া চিত্রার দিকে অগ্রসর হইয়া যাইত, কিন্তু রঞ্জনের জ্বলন্ত দৃষ্টি, তাহার ধীর ও শান্ত কণ্ঠস্বর তাহাকে নিশ্চল করিয়া দিল। সেই সময় রায় আসিয়া—"আঃ কি হচ্ছে মহিম! সবসময়ে কি অত উত্তেজিত হলে চলে?" এই কথা বলিতে বলিতে মহিমকে ধরিয়া চেয়ারে বসাইয়া দিলেন।)

রঞ্জন। আপনি মিথ্যে উত্তেজিত হচ্ছেন চিত্রা দেবী—এঁরা কেউ আপনার দুঃখ বুঝবে না।

চিত্রা। (রঞ্জনের মুখের দিকে তাকাইয়া শান্ত ও অশ্রুভারাক্রান্ত স্বরে) কিন্তু তুমি তো বুঝেছ বন্ধু—তোমার চোখে দেখছি জল!

রঞ্জন। তোমার সমস্ত দুঃখ আমি বুঝি বন্ধু—

চিত্রা। তাহলে আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে এঁদের সকল সমস্যার সমাধান করে দাও। তুমি যা বলবে তাই আমি মেনে নেব—

রঞ্জন। বল কি তোমার প্রশ্ন?

চিত্রা। এঁরা সকলে চান অনিলেন্দুকে আমি বিয়ে করি।

রঞ্জন। (দৃঢ় স্বরে) না, অনিলেন্দুবাবুর সঙ্গে তোমার বিয়ে হতে পারে না।

মহিম ও রায়। (একসঙ্গে) চিত্রা!

চিত্রা। (বিস্ময়ের ভান করিয়া) কি ব্যাপার, কি হল? তোমাদের মুখ দেখে মনে হচ্ছে, এই মাত্র এখানে যেন একটা ভূমিকম্প হয়ে গেল!

মহিম। (হতবুদ্ধি অবস্থায়) কিন্তু চিত্রা—তুমি নিজে কথা দিয়েছিলে! আজ খেলাচ্ছলে, সমস্ত বাইরের লোকের সামনে, এই রকম একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তরে তুমি না বলে দিলে।

চিত্রা। তুমি কি বলছ মহিম, আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না। বাইরের লোক এখানে কোথায়? এখানে সকলেই তো আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু—আমরা পরস্পরকে চিনি, জানি। আর রঞ্জনের সঙ্গে পরিচয় তো আমার অনেক দিনের—কত যুগ যুগান্তরের! তাই না রঞ্জন?

মহিম। কিন্তু তবুও এভাবে—

চিত্রা। (বাধা দিয়া) কি ভাবে আবার! আমি কতখানি ঝুঁকি নিয়েছিলাম, তা দেখলে না? রঞ্জনের 'হ্যাঁ' কিংবা 'না'র ওপর আমার সমস্ত জীবন নির্ভর করছিল! রঞ্জন তো "হ্যাঁ কর" এই কথাও বলতে পারত!

রায়। (ক্রুদ্ধ স্বরে) কিন্তু রঞ্জনের সঙ্গে এসবের যোগ কোথায়!

চিত্রা। যোগ একটা আছে বই কি! মহিমের সঙ্গে আমার দ্বিতীয় সাক্ষাতের পর থেকে কোন লোককেই আমি বিশ্বাস করতাম না। রঞ্জনই একমাত্র লোক যাকে প্রথম দর্শনেই আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হয়েছিল।

অনিলেন্দু। (ব্যঙ্গের সুরে) কিন্তু এমনও হতে পারে, রঞ্জনবাবুকে যতটা নির্বোধ ভাবা হয়েছে, ততটা নির্বোধ উনি নন্! উনি হয়ত কোথা থেকে শুনেছেন—

চিত্রা (বাধা দিয়া) যে, মহিম আমার বিয়েতে খরচ খরচা বাদে নগদ দশ হাজার টাকা যৌতুক দেবে—এই তো? সে সমস্যার সমাধানও আমি করে দিয়ে যাচ্ছি। শোন মহিম—আমার বিয়ের খরচা বা নগদ দশ হাজার টাকা যৌতুকের দায় থেকে আমি তোমায় মুক্তি দিয়ে যাচ্ছি। তোমার জীবনের পথ থেকে আমি নিঃশেষে নিজেকে মুছে দিয়ে যাব। তুমি নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে রায় দুহিতাকে বিয়ে করে তোমার বিশাল সম্পত্তির ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারীর স্বপ্ন দেখতে পার। আমার কাছে তোমার আর কোন দায় থাকবে না, সব দায় থেকে মুক্ত তুমি। আজ আমার জন্মদিন, আজই পুরনোর শেষ, নতুনের আরম্ভ—(এই কথা বলিতে বলিতে, চিত্রা দরজার দিকে অগ্রসর হইতেছিল, এমন সময় ঝড়ের বেগে প্রবেশ করিল আনন্দ! আনন্দকে দেখিয়া মনে হইতেছিল, সে বোধ হয় পাগল হইয়া গিয়াছে। তাহার হাতে একটি প্যাকেট)

আনন্দ। আমি এনেছি—চিত্রা আমি এনেছি—

চিত্রা। কি এনেছ আনন্দ?

আনন্দ। (উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে) তোমাকে পাওয়ার দাম—এই নাও, এই প্যাকেটেই দশ হাজার টাকা আছে।

চিত্রা। (প্যাকেটটি গ্রহণ করিয়া, উত্তেজিত হইয়া) শোন রায়, শোন মহিম, আনন্দ আমাকে পাওয়ার দাম এনেছে। এই প্যাকেটে দশ হাজার টাকা আছে—(অনিলেন্দুর দিকে ফিরিয়া) ভাবতে পার অনিলেন্দু—আমার মত নির্লজ্জ স্ত্রীলোক, যাকে তোমার ভাই এঘর থেকে বার করে দিতে বলেছিল, তার জন্যে আনন্দ দশ হাজার টাকা এনেছে! আচ্ছা অনিলেন্দু, এখনো তুমি আমাকে বিয়ে করতে রাজী আছ? আমাকে, মানে আনন্দর টাকা দিয়ে কেনা একটি মেয়েকে? (অনিলেন্দু নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার মুখ রক্তলেশহীন।)

আনন্দ। নিশ্চয় পারে, টাকার জন্তে ও পারে না এমন কাজই নেই। তুমি বললে ও এখনই এই ঘরময় নাকে খত দিতে পারে—(অনিলেন্দুর অবস্থা পূর্ব্ববৎ)

চিত্রা। বল অনিলেন্দু, চুপ করে রইলে কেন? বল, এখনো তুমি আমাকে বিয়ে করতে রাজী আছ? মনে রেখ রাতের পর রাত আমি মহিমের শয্যা-সঙ্গিনী হয়ে কাটিয়েছি। তার বদলে সে আমায় আশ্রয় দিয়েছে, মাসোহারা দিয়েছে। রায়ের শয্যাতেও আমার রাত কেটেছে; তার বদলে সে আমায় দিয়েছে, মুক্তোর নেকলেস, জড়োয়া গয়না। আনন্দ এই মাত্র আমায় দশ হাজার টাকা দিয়ে কিনেছে! এসব শোনার পরও, পার তুমি আমায় বিয়ে করতে? আমার তো মনে হয় না, এখানে এমন কেউ আছে, যে আমাকে বিয়ে করতে রাজী—বোধ হয় কৃপানাথও নয়।

কৃপানাথ। আমি তো নই! কিন্তু কেউ নয়, একথা বোধ হয় মিথ্যে। আমি অনেকক্ষণ থেকে রঞ্জনবাবুকে লক্ষ্য করছি। আমার মনে হয়, উনি বোধ হয় রাজী।

চিত্রা। (বিস্মিত হইয়া, রঞ্জনকে) কি রঞ্জন, তুমি নাকি আমাকে বিয়ে করতে রাজী?

রঞ্জন। (ধীর স্বরে) আমার সম্মতির তো কোন প্রশ্ন ওঠে না—প্রশ্ন, তোমার সম্মতি আছে কিনা?

চিত্রা। সেকি! আমার কিছু নেই জেনেও?

রঞ্জন। শুধু তুমিই আমার পক্ষে যথেষ্ট।

চিত্রা। আনন্দ আমাকে টাকা দিয়ে কিনেছে জেনেও?

রঞ্জন। আনন্দ টাকা দিয়ে তোমার দেহটাকে কিনতে পারে—তোমাকে নয়। দুঃখ তোমাকে পুড়িয়ে খাঁটি সোনার চেয়েও খাঁটি করে দিয়েছে—কারো কলুষ স্পর্শ তোমাকে কলঙ্কিত করতে পারে না।

চিত্রা। তোমার তো দেখছি বড় দয়া রঞ্জন! আমার মত পতিতাকে বিয়ে করে তুমি উদ্ধার করতে চাও!

রঞ্জন। আমি জানি তুমি নিষ্পাপ চিত্রা।

চিত্রা। লোকে তোমাকে নির্বোধ বলে, হয়ত তুমি তা নও। কিন্তু তুমি যাই হও, আমাকে বিয়ে করে তুমি করবে কি? জীবন সম্বন্ধে তোমার কোন ধারণাই নেই। বৌয়ের চেয়ে তোমার বেশী দরকার একজন নার্সের, যে তোমার দেখাশুনো করতে পারবে।

রঞ্জন। (আবেগ-কম্পিত কণ্ঠস্বরে) হয়ত তোমার কথাই ঠিক চিত্রা, জীবন সম্বন্ধে কোন ধারণাই আমার নেই। তবু তুমি যদি আমাকে গ্রহণ করতে সম্মত হও, আমি নিজেকে ধন্য মনে করব। তোমার সঙ্গে আমার কিসের তুলনা! পাপের যা কিছু কুৎসিত, সব পুড়ে ছাই হয়ে গেছে দুঃখের আগুনে। নিষ্কলুষ তুমি। তোমার কিসের লজ্জা, কিসের ভয়? কেন তোমায় চলে যেতে হবে আনন্দর সঙ্গে—কেন—কেন? তুমি মহিমবাবুর দশ হাজার টাকা এক কথায় ফিরিয়ে দিয়েছ—এখানে কটা লোকের সাহস আছে তা করবার! তুমি বিশ্বাস কর চিত্রা, আমার জীবন, মন, প্রাণ এ সমস্তই তোমার। হয়ত অর্থের দিক থেকে আমি দরিদ্র—তবু অহোরাত্র পরিশ্রম করে আমি তোমায় সুখে রাখবার চেষ্টা করব—(উত্তেজনায় তাহার সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইতেছিল) (কৃপানাথ সশব্দে হাসিয়া উঠিল, আনন্দের মুখে ক্রোধের ভাব। মহিমের মুখে দেখা দিল মৃদু হাসির রেখা, অনিলেন্দু নীরব। চিত্রার মুখ দেখিয়া মনে হইতেছিল সে কোনমতে অশ্রুরোধ করিয়া রহিয়াছে)

রায়। (বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠস্বরে) রঞ্জন, কি পাগলের মত প্রলাপ বকছ—স্থির হয়ে বস।

রঞ্জন। আমি সঙ্গতিহীন বলে হয়ত আপনারা হাসছেন। কিন্তু

এমনও হ'তে পারে আমি সত্যিই সঙ্গতিহীন নই। চিত্রা দেবীকে সুখে রাখবার জন্যে হয়ত আমাকে অহোরাত্র পরিশ্রম নাও করতে হতে পারে। ওয়াল্টেয়ারে থাকতে এখানকার বিখ্যাত এটর্নী সরোজ দত্তর কাছ থেকে আমি একটা চিঠি পাই। এই চিঠির জন্যেই আমার কলকাতায় আসা—(পকেট হইতে চিঠি বাহির করিয়া)—এ চিঠির মর্ম—আমার পিতৃবন্ধু কীর্ত্তিনাথ রায়, তাঁর নিজের কোন উত্তরাধিকারী না থাকায়, তাঁর সম্পত্তির অর্দ্ধেক দিয়ে গেছেন আমাকে আর বাকী অর্দ্ধেক দিয়ে গেছেন এক উন্মাদ আশ্রমে।

রায়। এ দেখছি শুধু নির্বোধ নয়, বদ্ধ পাগল!

কৃপানাথ। কই দেখি, চিঠি দেখি—আমি সরোজ দত্তর সই চিনি। (রঞ্জনের হাত হইতে চিঠি লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিল।)

কৃপানাথ। (চিঠি পড়িয়া) রঞ্জনবাবু, আপনি কত টাকার সম্পত্তির মালিক হয়েছেন, জানেন কি? প্রায় দশ লক্ষ টাকার!

রায়। অসম্ভব!

কৃপানাথ। (চিঠি রঞ্জনের হাতে ফিরাইয়া দিয়া) congratulation, রঞ্জনবাবু—

রায়। আশ্চর্য, এতো গল্প-উপন্যাসেই ঘটে! আজই রঞ্জনকে আমি চাকরি দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছি! (নিকটে আসিয়া রঞ্জনের পিঠ চাপড়াইতে চাপড়াইতে) congratulation রঞ্জন—তুমি আমার ছেলের মত। কোন পরামর্শের দরকার হলে, আমার কাছে আসতে যেন দ্বিধা বোধ করো না। খবরটা আমার স্ত্রী পেলে কত আনন্দ করবেন—

কৃপানাথ। (পকেট হইতে একখানি কার্ড বাহির করিয়া রঞ্জনের হাতে দিল) আমার কথাটা মনে রাখবেন স্যার! পায়ের তলায়

পড়ে আছি, এই মনে করে ওই ঠিকানায় খবর দিলে, যে কোন কাজ হ'ক, এই শর্মা করে দেবে।

চিত্রা। (মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে বিচিত্র এক মৃদু হাসির রেখা। রঞ্জনের নিকট আসিয়া তাহার মুখ তুলিয়া ধরিয়া) তাহলে আমার জীবনে এতদিনে রূপকথার রাজপুত্র এলো! (মহিম ও রায়কে) তোমরা সকলে এস, আমাদের শুভেচ্ছা জানাও—আমি আজ রাজার ঘরণী! (রঞ্জনকে টানিয়া আনিয়া নিজের পাশে বসাইয়া দিল) এস রঞ্জন বস—তোমাকে আমাকে ঘিরে আজ এরা আনন্দ করবে—

রায়। রঞ্জন, তুমি বরং ওপরে গিয়ে একটু বিশ্রাম কর।

চিত্রা। না রায়, রঞ্জন এখন কোথাও যাবে না। সে বসবে এইখানে আমার পাশে—আমাকে অপমানের হাত থেকে রক্ষা করবে। জান রায়—এখন বোধ হয় তোমার স্ত্রী আমার সঙ্গে যেচে আলাপ করলেও করতে পারেন—(আনন্দর দিকে দৃষ্টি পড়িতে) তুমি বড় দেরী করে ফেলেছ আনন্দ। তোমার টাকা তুমি ফিরিয়ে নিয়ে যাও, রঞ্জন আমাকে বিয়ে করবে বলেছে—

আনন্দ। (ক্রোধে ও হতাশায় তাহার মুখের ভাব বিকৃত হইয়া উঠিয়াছে) চিত্রা আমার, রঞ্জন।

চিত্রা। তুমি আমায় টাকা দিয়ে কিনতে চেয়েছিলে, কিন্তু রঞ্জন আমাকে বিয়ে করবে।

আনন্দ। আমিও তোমাকে বিয়ে করব—এই মুহূর্তে—এখুনি।

চিত্রা। শুনেছ রঞ্জন, আনন্দ তোমার ভাবী পত্নীকে নিলেমে কেনবার চেষ্টা করছে—

রঞ্জন। (ধীর স্বরে) আনন্দ তোমায় ভালবাসে চিত্রা।

চিত্রা। আচ্ছা রঞ্জন, পরে তোমার একথা ভেবে লজ্জা হবে না, যে আর একটু হলে আনন্দ আমায় টাকা দিয়ে কিনে নিয়েছিল?

রঞ্জন। তুমি তখন প্রকৃতিস্থ ছিলে না চিত্রা।

চিত্রা। আচ্ছা আনন্দর কথা না হয় বাদই দিলাম, কিন্তু মহিমের কথা?

রঞ্জন। না, ওকাজ তুমি স্বেচ্ছায় কর নি—অবস্থা তোমাকে বাধ্য করেছিল—

চিত্রা। এ নিয়ে কোনদিন তুমি আমায় কোন প্রশ্ন করবে না?

রঞ্জন। কোনদিন না, কখনো না! আমিতো বলেছি চিত্রা, আমাকে যদি তুমি গ্রহণ করতে সম্মত হও, আমি নিজেকে ধন্য মনে করব। আজ সাময়িক উত্তেজনায় তুমি নিজেকে ধ্বংসের পথে এগিয়ে দিচ্ছিলে, কিন্তু পরে কোনদিন তুমি নিজেকে ক্ষমা করতে পারতে না। তুমি তো কোন দোষী দোষে নও। আনন্দ তোমাকে টাকা দিয়ে কিনতে চেয়েছিল, মহিমবাবু সুবিধে পেয়ে তোমার ওপর অত্যাচার করেছিলেন, অনিলেন্দু বাবু তোমাকে প্রতারিত করবার চেষ্টা করছিলেন—এ সবের জন্যে কি তুমি দায়ী? আনন্দর সঙ্গে চলে যেতে চাওয়া অসুস্থ মনের বিকার ছাড়া আর কিছুই নয়। ওর সঙ্গে তুমি থাকতে পারবে না, তোমার অহঙ্কারই তোমায় থাকতে বাধা দেবে। আজ সকালে আমি তোমায় প্রথম দেখেছি। দেখেই মনে হয়েছে তুমি আমার অনেক দিনের চেনা—দেখেছি দুঃখের আগুনের আভা তোমার মুখে! তুমি আমায় বিশ্বাস কর চিত্রা, জীবনে কোনদিন তুমি আমার কাছ থেকে এতটুকু অশ্রদ্ধা পাবে না—(কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে সচেতন হইয়া দেখিল, সকলে অবাক্ হইয়া তাহার দিকে দেখিতেছে—তখন অপ্রস্তুতের ন্যায় থামিয়া গেল।)

অনিলেন্দু। (এতক্ষণে নিজের হতবুদ্ধি অবস্থা কাটাইয়া উঠিয়াছে। ক্রোধ ও ব্যঙ্গমিশ্রিত স্বরে) বাঃ রঞ্জনবাবু বাঃ! কে বলে আপনি

নির্বোধ! স্তুতিবাদে অপরের মন কিভাবে জয় করতে হয় সে বিদ্যা আপনার বেশ জানা আছে দেখছি!

রায়। (মহিমকে, মৃদুস্বরে) আশ্চর্য, এরকম অদ্ভুত লোক, এর আগে আমি কখনো দেখি নি!

মহিম। (মৃদুস্বরে) কিন্তু ধ্বংস এর অনিবার্য!

চিত্রা। (স্নিগ্ধ কণ্ঠস্বরে) তোমার এ দয়ার কথা আমার চিরকাল মনে থাকবে রঞ্জন। এরা সকলে আমায় টাকা দিয়ে কিনতে চেয়েছে! কিন্তু তুমি আমায় সম্মানিত করেছ বন্ধু, তুমি আমায় বিয়ে করতে চেয়েছ! (হঠাৎ আনন্দর দিকে দৃষ্টি পড়িতে) একি আনন্দ, এরি মধ্যে চঞ্চল হয়ে উঠলে? আমি এখনও কিছু ঠিক করি নি, হয়ত তোমার সঙ্গে যেতেও পারি। কোথায় নিয়ে যাবে তুমি আমায়?

আনন্দ। (আবেগ কম্পিত কণ্ঠস্বরে) কলকাতার বাইরে, মজিলে, আমার বাগানবাড়িতে! (আনন্দ চিত্রার দিকে হাত বাড়াইয়া দিল। চিত্রাকে আনন্দর দিকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া রঞ্জন উঠিয়া দাঁড়াইল।)

রঞ্জন। চিত্রা—চিত্রা—

চিত্রা। আমাকে বিয়ে করে তুমি শান্তি পাবে না রঞ্জন—

রঞ্জন। অশান্তি তো পাব—সেই অশান্তিই আমার শান্তি—

চিত্রা। আমি কি, তা তুমি জান না রঞ্জন। মহিমকে জিজ্ঞেস করো, আমার স্বরূপ জানতে পারবে—

রঞ্জন। তোমার স্বরূপ আমি জেনেছি চিত্রা—আমার কাউকে জিজ্ঞেস করবার দরকার নেই।

চিত্রা। তা হয় না রঞ্জন—তোমাকে বিয়ে করে তোমার জীবন নষ্ট করে দিতে পারব না। চল আনন্দ, এখানে আর বেশীক্ষণ থাকলে রঞ্জনের নির্বুদ্ধিতা আমাকেও আচ্ছন্ন করে ফেলবে! (অনিলেন্দুর প্রতি দৃষ্টি পড়িতে) কি অনিলেন্দু, বড্ড রেগেছ বলে

মনে হচ্ছে! অনেকগুলো টাকা লোকসান হয়ে গেল, না? আচ্ছা অনিলেন্দু, টাকার জন্যে তুমি কত নীচে নামতে পার? আচ্ছা, ধর যদি বলি, যেখানে দাঁড়িয়ে আছ, ওখান থেকে নাকে খত দিতে দিতে এসে এই টাকা তোমায় নিতে হবে—পারবে তুমি? যদি পারো তাহলে এ টাকা তোমার—নইলে—(আনন্দকে) আনন্দ এ টাকা নিয়ে আমি যা ইচ্ছে করতে পারি তো?

আনন্দ। যা ইচ্ছে করতে পার—যাকে ইচ্ছে দিতে পার—ছিঁড়ে ফেলতে পার—ইচ্ছে হয় তো পুড়িয়ে ছাই করে ফেলতে পার!

চিত্রা। তাই করব আনন্দ। অনিলেন্দু যদি ওভাবে এসে না নেয়, তবে পুড়িয়েই ফেলব। নাও, নাও, অনিলেন্দু! দশ হাজার টাকার লোভে তুমি আমায় বিয়ে করছিলে। এতে সেই দশ হাজার টাকাই আছে—নাও আরম্ভ কর—(ক্রুদ্ধ অনিলেন্দুর মুখ লজ্জায়, ক্ষোভে, রক্তিম হইয়া উঠিয়াছে; কি যেন বলিতে গেল, পারিল না। দেখা গেল, তাহার সর্বাঙ্গ কম্পিত হইতেছে।)

চিত্রা। (ঘৃণা মিশ্রিত কণ্ঠস্বরে) আনন্দ, দেশলাই বার কর। চলে এস অনিলেন্দু—কোন লজ্জা নেই! দশ হাজার টাকার জন্যে মহিমের রক্ষিতাকে বিয়ে করছিলে, আর এ তো সামান্য কাজ—অথচ টাকা সেই একই। নাও, নাও আরম্ভ কর—

রায়। (চিত্রার দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতে আসিতে) চিত্রা, তুমি অসুস্থ, চল তোমায় বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি—

আনন্দ। (উন্মত্তের ন্যায় চীৎকার করিয়া) খবরদার। She is my queen! কাছে এগিয়ে এস না, আমি কারো খাতির করব না—(চিত্রাকে)—বল চিত্রা, কি করতে হবে? আগুন ধরিয়ে দেব এগুলোয়!

চিত্রা। (উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে) পারবে আনন্দ?

আনন্দ। তুমি আমার হবে, আর আমি এটুকু পারব না! জ্বালি আগুন?

চিত্রা। (অনিলেন্দুর দিকে দেখিয়া) জ্বাল্—

কৃপানাথ। (উত্তেজিত অবস্থায় ছুটিয়া আসিয়া অনিলেন্দুকে ঠেলিতে লাগিল) করে ফেল অনিলেন্দু!—এ দশ হাজার টাকা! নির্বোধের মত কাজ করো না—

(অনিলেন্দু কৃপানাথকে ঠেলিয়া ঘর হইতে যাইতে উদ্যত হইল। কিন্তু দুই পা যাইতে মুর্ছিতপ্রায় অবস্থায় পড়িয়া গেল।)

রায় ও মহিম। একি! অজ্ঞান হয়ে গেল!

(রায় ছুটিয়া আসিয়া দেখিলেন, অনিলেন্দু মূর্চ্ছিত হয় নাই, তবে মুর্ছিতপ্রায় অবস্থা। তিনি ও মহিম অনিলেন্দুকে ধরিয়া চেয়ারে বসাইয়া দিলেন। ইতিমধ্যে আনন্দ দেশলাই জ্বালিয়া প্যাকেটে অগ্নিসংযোগ করিতে উদ্যত)।

চিত্রা। দাঁড়াও আনন্দ। (অনিলেন্দুর নিকট গিয়া) চমৎকার অনিলেন্দু! আমি জানতাম, টাকার চেয়ে বড় জিনিষ তোমার কাছে আর কিছু নেই। কিন্তু আজ দেখলাম সে ধারণা ভুল। তোমার আত্ম-অহঙ্কার টাকার লোভের চেয়েও প্রবল—(অনিলেন্দুর কোলের উপর প্যাকেটটি ফেলিয়া দিয়া) এ টাকা তোমার অনিলেন্দু। আমাকে না পেয়ে যে টাকা তুমি হারালে, আশা করি তার ক্ষোভ এতে মিটবে!—চল আনন্দ—

আনন্দ। কোথায় যাবে? আমার বাড়িতে?

চিত্রা। কেন? বাড়িতে কেন?

আনন্দ। সেখানেই তো আমাদের বিয়ে হবে—

চিত্রা। না না, বিয়ে তোমায় করতে হবে না আনন্দ, তুমি শুধু আমায় বন্দীশালা থেকে মুক্ত করে নিয়ে চল! চব্বিশ বছরের অন্ধকার জমাট হয়ে আমাকে বন্দী করে রেখেছে—

আনন্দ। তুমি যা বলবে তাই হবে চিত্রা—

চিত্রা। তবে চল আনন্দ, মঞ্জিলে, তোমার বাগান বাড়ীতে।

আনন্দ। তাই চল চিত্রা—কৃপানাথ, চল মঞ্জিল—

(কৃপানাথ বাহির হইয়া গেল, তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আনন্দ ও চিত্রা বাহির হইয়া যাইতেছিল—হঠাৎ রঞ্জনের কণ্ঠস্বর শুনিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল)।

রঞ্জন। (অগ্রসর হইয়া আসিতে আসিতে) চিত্রা—চিত্রা—ও আলো নয় চিত্রা, অন্ধকার থেকে আরো অন্ধকার—

চিত্রা। হয়ত তাই রঞ্জন—তবু তুমি যা বলছ তা হয় না। একি রঞ্জন, তোমার চোখে জল! কিন্তু তা হয় না রঞ্জন, তোমার জীবন আমি নষ্ট করে দিতে পারব না! তার চেয়ে তুমি বরং রায়ের মেয়ে সুমিত্রাকে বিয়ে কর, সুখী হবে—আর মেয়েটাও মহিমের হাত থেকে উদ্ধার পাবে—(চিত্রা নিজের অজ্ঞাতসারে ক্রমশঃ রঞ্জনের দিকে সরিয়া আসিতেছিল। রঞ্জনের নিকট আসিয়া, মৃদু ও অশ্রুভারাক্রান্ত স্বরে) রঞ্জন—রঞ্জন—তুমি ঠিক ধরেছিলে বন্ধু! তোমায় আমায় অনেক দিনের চেনা! সেই অনেক দিন আগে, মহিমের বাগান বাড়ীতে, আমি যখন ফুলের মত ফুটে উঠছিলাম, তখন তুমি স্বপ্নে আমার কাছে আসা যাওয়া করতে বন্ধু! স্বপ্নে দেখতাম, তোমারই মত একজনকে—করুণায় কোমল, সৎ, নির্ভীক অথচ নির্বোধ! যে তোমারই মত নির্ভীক ভাবে সকলের সামনে এসে বলবে,—"কোন পাপ তোমায় স্পর্শ করেনি চিত্রা, তুমি নির্মল, তুমি নিষ্কলুষ"—(হঠাৎ শিহরিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল) আনন্দ—আমার পা দুটো অসাড় হয়ে গেছে—তুমি আমায় জোর করে নিয়ে চল আনন্দ—জোর করে নিয়ে চল—(উচ্ছ্বসিত হইয়া ক্রন্দন করিয়া উঠিল)

(রঞ্জন চিত্রাকে ধরিবার পূর্বেই আনন্দ চিত্রাকে দুই বাহুর উপর তুলিয়া লইয়া বাহিরে যাইবার দরজার দিকে অগ্রসর হইল।)

চিত্রা। (আনন্দর বুকের মধ্যে মুখ লুকাইয়া, ক্রন্দন-জড়িত কণ্ঠস্বরে)

জানি সখে,
তোমার হৃদয় মোর হৃদয়-আলোকে
চকিতে দেখেছি কতবার শুধু যেন
চক্ষের পলক পাতে ;

রঞ্জন। (অগ্রসর হইয়া আসিতে আসিতে অভিভূতের ন্যায়)—থাকো তবে—থাকো—চিত্রা—যেয়ো না—

হেথা বেণুমতী তীরে মোরা দুইজন
অভিনব স্বর্গলোক করিব সৃজন
এ নির্জন বনচ্ছায়া সাথে মিশাইয়া
নিভৃত বিশ্রব্ধ মুগ্ধ দুইখানি হিয়া
নিখিলবিস্মৃত। ওগো বন্ধু, আমি জানি
রহস্য তোমার।

(ততক্ষণে আনন্দ চিত্রাকে লইয়া বাহির হইয়া গিয়াছে)

রঞ্জন। চিত্রা—আমিও যাচ্ছি, দাঁড়াও।

রায়। (দ্রুতপদে আসিয়া রঞ্জনকে ধরিলেন) কোথায় যাবে রঞ্জন—ও সর্বনাশের পথ! আমার কথা শোন—আমি তোমার বাবার মত—

রঞ্জন। (রায়ের দিকে ব্যাকুল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া) আমাকে যেতেই হবে—আমায় ছেড়ে দিন—(নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়া বাহির হইয়া গেল)।

রায়। (হতবুদ্ধি অবস্থায়, রঞ্জনের গমন পথের দিকে চাহিয়া) নির্বোধ—বুঝলে মহিম—একেবারে নির্বোধ!

মহিম। নির্বোধ? তা হবেও বা।

(অনিলেন্দুকে একই ভাবে আচ্ছন্ন অবস্থায় বসিয়া থাকিতে দেখা গেল। তাহার শূন্য দৃষ্টি—কোলের উপর পড়িয়া রহিয়াছে সেই নোটের প্যাকেট)

পর্দাও এই সঙ্গে নামিয়া আসিল।

দ্বিতীয় অঙ্ক

(ছয় মাস পরের কথা। কলিকাতায় রঞ্জনের ফ্ল্যাটের বারান্দা। কয়েকটি বসিবার আসন ও একটি টেবিল পাতা রহিয়াছে। রঞ্জন অন্যমনস্কের ন্যায় একটিতে বসিয়া আছে। রঞ্জনের স্বাস্থ্য ও পোষাক-পরিচ্ছদ পূর্ব্বাপেক্ষা উন্নততর। বারান্দার পিছন দিকে ভিতরে যাইবার দরজা। বারান্দার দক্ষিণ পার্শ্বে আরও একটি দরজা রহিয়াছে। দেয়ালে টাঙ্গানো রহিয়াছে তিনখানি ছবি। একটি চৈতন্যদেবের সংসার ত্যাগ, আর একটি বুদ্ধদেবের বোধি লাভ এবং তৃতীয়টি ক্রশ বহনরত খ্রীষ্টের ছবি। রবিবার, প্রাতঃকাল—বেলা প্রায় সাড়ে দশটা।)

রঞ্জন। (দক্ষিণ পার্শ্বের দরজা দিয়া কৃপানাথকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া এই যে কৃপানাথ, এস—আমি তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম।

কৃপানাথ। আপনি আমায় ডেকে পাঠিয়েছেন স্যার ?

রঞ্জন। হ্যাঁ—কেন, তা তো তুমি জানই ! তোমার চিঠি পেয়েই আমি এখানে এসেছি।

কৃপানাথ। আমি খবর পেয়েই এখানে চলে আসছিলাম, কিন্তু আমার সেই পাজী ভাইপোটা—

রঞ্জন। (বাধা দিয়া) ওসব কথা এখন থাক কৃপানাথ—তুমি কাজের কথা বল।

কৃপানাথ। আজ্ঞে সে কথা আমি কি করে জানব ? সে তো ওয়াল্টেয়ারে আপনার কাছেই চলে গিয়েছিল।

রঞ্জন। বাজে কথা রাখ কৃপানাথ। তুমি বেশ ভাল করেই জান চিত্রা এখন কোথায়। ওয়াল্টেয়ারে তোমার যে চিঠি পেয়ে আমি এখানে চলে এসেছি, সে চিঠির মর্ম্মই হচ্ছে তাই। (কৃপানাথকে

চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া, ব্যাকুল স্বরে) কৃপানাথ বল—আমি তোমায় টাকা দেব কৃপানাথ।

কৃপানাথ। আজ্ঞে না না, আপনার কাছ থেকে টাকা নেব, এ কি একটা কথা হ'ল! তবে সংসারে এখন—

রঞ্জন। (পকেট হইতে কিছু টাকা বাহির করিয়া কৃপানাথের হাতে দিয়া) আমি জানি কৃপানাথ সংসারে তোমার এখন বড্ড টানাটানি—এখন বল চিত্রা কোথায়?

কৃপানাথ। (টাকা লইয়া) আজ্ঞে এখানে, কলকাতায়—মানে গ্রে ষ্ট্রীটে, নম্বর—সতেরর দুই।

রঞ্জন। (নোটবুকে ঠিকানা লিখিয়া লইয়া) আনন্দ জানে এ ঠিকানা?

কৃপানাথ। আজ্ঞে—

রঞ্জন। (ব্যাকুল স্বরে) আমার কাছে কিছু লুকিও না কৃপানাথ—

কৃপানাথ। আমি ইচ্ছে করে তাকে বলি নি স্যার। সে ভয় দেখিয়ে আমার কাছ থেকে ঠিকানা বার করে নিয়েছে। সে অত্যাচার আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না! আমার পেছনে কুকুর পর্যন্ত লেলিয়ে দিয়েছে। শেষে ভয় দেখাল, ঠিকানা না দিলে খুন করবে। তখন আমি তাকে ঠিকানা বলতে বাধ্য হয়েছিলাম স্যার—

রঞ্জন। একটা কথার সত্যি জবাব দেবে কৃপানাথ?

কৃপানাথ। নিশ্চয় দেব স্যার—

রঞ্জন। ঠিক বিয়ের দিন চিত্রা আনন্দর কাছ থেকে কেন পালিয়ে এসেছিল বলতে পার কৃপানাথ?

কৃপানাথ। আজ্ঞে তা ঠিক বলতে পারি না। তবে ঘটনাটা আমার স্পষ্ট মনে আছে। প্রায় মাস চারেক আগের কথা। সকালে বাড়িতে বসে চা খাচ্ছি, এমন সময় দেখি চিত্রা! দেখে মনে হ'ল,

বোধ হয় মাথা খারাপ হয়ে গেছে। ঘরে ঢুকেই বললে, "রাতে ঘুমুতে পারছি না কৃপানাথ, মনে হচ্ছে গা-ময় কুৎসিত রোগ হয়েছে—অসহ্য হয়ে উঠেছে আনন্দর ছোঁয়া।" হাঁ হয়ে মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। খিল খিল করে হেসে উঠে বললে, "হাঁ করে মুখের দিকে তাকিয়ে দেখছ কি? সন্ন্যাসী উপগুপ্তর ঠিকানা বলতে পার?" কি মনে হ'ল—দিয়ে দিলাম আপনার ঠিকানা। আচ্ছা ওয়াল্টেয়ারে আপনার ওখানে ছিল কদিন?

রঞ্জন। মাত্র তিন দিন! একদিন ডক্টর আলির কাছে গিয়েছিলাম, ওরই চিকিৎসা সম্বন্ধে আলোচনা করতে। ফিরে এসে দেখি নেই। শুধু একটা চিঠিতে লিখে রেখে গেছে—"তোমার জীবন নষ্ট হয়ে যাবে এটা কিছুতেই সহ্য করতে পারলাম না। আনন্দকে হয়ত সহ্য করতে পারব—তার কাছেই ফিরে যাচ্ছি। আমার অনুরোধ, খোঁজ নেবার চেষ্টা করো না; দরকার হলে কৃপানাথকে বলে আমিই তোমায় ডেকে পাঠাব।" তাইতো তোমার চিঠি পেয়েই চলে এলাম—

কৃপানাথ। আমি যেটুকু জানি সবই আপনাকে বলেছি স্যার—

রঞ্জন। তা বলেছ বটে—(হঠাৎ আগ্রহান্বিত হইয়া) হ্যাঁ, ভাল কথা—বিমলেন্দুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল তোমার?

কৃপানাথ। বিমলেন্দুর সঙ্গে? হ্যাঁ, হয়েছিল বই কি! তাকে আপনার কথা জিজ্ঞেসও করেছিলাম—

রঞ্জন। কি বললে সে?

কৃপানাথ। সে বললে, তার এখন মরবার সময় নেই। সে আবার রাজনীতি নিয়ে খুব মেতেছে কিনা? তবে সে বলে পাঠিয়েছে, আপনি তাকে যে চিঠি পাঠিয়েছিলেন, সে চিঠি সে যথাস্থানে পৌঁছে দিয়েছে।

রঞ্জন। (আগ্রহান্বিত স্বরে) কোন উত্তর আনে নি সে?

কৃপানাথ। না কোন উত্তর সে পায় নি। (মৃদু হাসিয়া) আপনি যদি বলেন তো সুমিত্রা দেবীর কাছ থেকে উত্তর আমি আপনাকে এনে দিতে পারি।

রঞ্জন। (গম্ভীর স্বরে) থাক কৃপানাথ—

কৃপানাথ। (ভীত স্বরে) আমার ভুল হয়ে গেছে স্যার। (একটু থামিয়া) আর একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি স্যার?

রঞ্জন। বল।

কৃপানাথ। অনিলেন্দু কি সে টাকাটা সত্যিই—?

রঞ্জন। (প্রশ্ন শেষ করিতে না দিয়া) কি আশ্চর্য—কথাটা তুমি আজও বিশ্বাস করতে পার নি দেখছি! অনিলেন্দু সত্যিই টাকাটা আমার হাতে ফিরিয়ে দিয়েছিল। আমি সে টাকা আনন্দকে ফিরিয়ে দিয়েছি।

কৃপানাথ। আশ্চর্য! এরকম নির্বোধও দুনিয়ায় আছে?

রঞ্জন। (মৃদু হাসিয়া) সবাই তোমার মত বুদ্ধিমান নয় কৃপানাথ। আচ্ছা কৃপানাথ তাহলে তুমি এখন এস—(কৃপানাথ নমস্কার করিয়া দক্ষিণ পার্শ্বের দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেল। কিন্তু প্রায় মুহূর্তের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া ভীত স্বরে)—সর্ব্বনাশ—আনন্দ আসছে? ভাগ্যিস্ মাথা নীচু করে ওপরে উঠছে, তাই আমায় দেখতে পায় নি—এখন কি হবে? আমায় এখানে দেখলে সে খুন করবে স্যার।

রঞ্জন। (বারান্দার পিছন দিকের দরজা দেখাইয়া) ভেতর দিয়ে চলে যাও কৃপানাথ, পেছনে লোহার ঘুরনো সিঁড়ি পাবে।

(কৃপানাথ দ্রুত প্রস্থান করিল)

রঞ্জন। (মৃদু স্বরে) আনন্দ!

আনন্দ। (প্রবেশ করিতে করিতে) আমায় ডাকছিলে রঞ্জন?—দেখ, ডাকবামাত্রই এসে পড়েছি!

রঞ্জন। এস আনন্দ, বস—

(আনন্দ আসিয়া রঞ্জনের সম্মুখে দাঁড়াইল। পরিধানে সিল্কের পাঞ্জাবি ও ঢিলা পাজামা। মনে যে তাহার ঝড় উঠিয়াছে, তাহার কিছুটা আভাস মুখেও পাওয়া যাইতেছে। রঞ্জনের মুখের উপর তাহার স্থির-দৃষ্টি নিবদ্ধ।)

রঞ্জন। ও ভাবে তাকিয়ে আছ যে আনন্দ—বস—(আনন্দ বসিলে) আচ্ছা আনন্দ, আমি যে কাল দুপুরের ট্রেণে কলকাতায় এসে পৌঁছব, একথা তুমি জানতে—না?

আনন্দ। (মৃদু হাসিয়া) আমার কি রকম মনে হয়েছিল, তুমি আজ কালের মধ্যে এসে পড়তে পার!

রঞ্জন। তাহলে তুমি ঠিক জানতে না, কাল আমি এখানে এসে পৌঁছব?

আনন্দ। (বিরক্তিমিশ্রিত স্বরে) না, তা জানব কি করে?

রঞ্জন। কিন্তু, এই সামান্য প্রশ্নে তুমি এত বিরক্তই বা হচ্ছ কেন?

আনন্দ। তুমিই বা এ প্রশ্ন করছ কেন?

রঞ্জন। কাল দুপুরে আমি যখন ট্রেণ থেকে নামলাম, তখন মনে হ'ল এক জোড়া চোখের দৃষ্টি যেন আমার অনুসরণ করছে। সে চোখের সঙ্গে তোমার চোখের মিল আছে আনন্দ। তারপর আরো একবার তোমায় দেখতে পেলাম আনন্দ, ভিড়ের মধ্যে তোমার মুখখানা একবার ভেসে উঠেই মিলিয়ে গেল।

আনন্দ। (নিস্তেজ কণ্ঠস্বরে) ও তোমার অসুস্থ মনের কল্পনা, রঞ্জন—

রঞ্জন। তাই হয়ত হবে! তবে তোমার মুখ চোখের সামনে ভেসে ওঠার পর সত্যিই অসুস্থ বোধ করছিলাম আনন্দ। মনে হচ্ছিল

আমাব পুরনো রোগ বোধ হয় ফিরে আসছে। মনে হচ্ছিল আমি আবার মূর্ছা যাব।

আনন্দ। তুমি আমাকে ভয় কর রঞ্জন ?

রঞ্জন। ভয়? ভয় আমি কাউকে করি না আনন্দ। তবে তোমার দুঃখ দেখলে আমার বড় কষ্ট হয়।

আনন্দ। (মৃদু হাসিয়া) আমার দুঃখ দেখে তোমার কষ্ট হয়! আজ টাকার মালিক হয়ে দেখছি পাশার চাল বদলে গেছে। একদিনের কথা মনে কর রঞ্জন—ট্রেণে তুমি আসছিলে ওয়াল্টেয়ার থেকে কলকাতায়, হাতে ছোট একটা পুঁটলি, নিঃস্ব অবস্থা।

রঞ্জন। সেদিনও তোমায় দেখে আমার কষ্ট হয়েছিল আনন্দ। সেদিনও মনে হয়েছিল, কি এক তৃষ্ণা, কি এক না পাওয়ার দুঃখ, তোমার মনের মধ্যে গুমরে গুমরে উঠেছে।

আনন্দ। লোকে তোমায় নির্বোধ বলে, এটা কিন্তু ভুল রঞ্জন—তুমি পাগল, তোমার মাথার ঠিক নেই।

রঞ্জন। (মৃদু হাসিয়া) পাগল—হয়তো তাই! (এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া)—আচ্ছা আনন্দ, তোমাদের বিয়ে কি খুব শিগগির হবে ?

আনন্দ। তুমি তো জান রঞ্জন—সেটা আমার কথার ওপর নির্ভর করে না।

রঞ্জন। (আন্তরিকতাপূর্ণ স্বরে) আমার একটা কথা বিশ্বাস করবে আনন্দ? তোমাদের পথে বাধা হয়ে থাকবার ইচ্ছে আমার নেই। এর আগে যখন তোমাদের বিয়ে ঠিক হয়েছিল তখনও আমি ওয়াল্টেয়ারে ছিলাম। চিত্রা নিজে থেকেই পালিয়ে এসে আকুল হয়ে আমাকে বলেছিল—"রঞ্জন আমাকে বাঁচাও, আনন্দের হাত থেকে আমাকে বাঁচাও,।" কিন্তু আমার কাছেও সে রইল না।

আবার তোমার কাছে ফিরে এল। (আবেগব্যাকুল কণ্ঠস্বরে) চিত্রার মনের গতি তুমি বোঝবার চেষ্টা করেছ আনন্দ? ভাল করে তার দিকে চেয়ে দেখেছ? আমার মনে হয় মনের দিক থেকে চিত্রা খুবই অসুস্থ। ওকে তুমি কলকাতা থেকে সরিয়ে অন্য কোন স্বাস্থ্যকর জায়গায় পাঠাবার চেষ্টা কর আনন্দ। আমার সম্বন্ধে তোমার এতটুকু চিন্তিত হবার কারণ নেই। যদি সত্যিই তোমাদের মনের মিল হয়ে থাকে, আমি চিত্রার সঙ্গে জীবনে কোনদিন দেখা পর্যন্ত করবার চেষ্টা করব না। (আনন্দের মুখে ফুটিয়া উঠিল অবিশ্বাসের হাসি) তুমি হাসছ আনন্দ, তুমি বিশ্বাস করছ না। সত্যিই তুমি যদি চাও, আমি তার সঙ্গে কোনদিন দেখা করব না! তবে একটা কথা। আমি তোমাকে কোনদিন মিথ্যে বলি নি আনন্দ, আজও বলব না। আমার ধারণা এ বিয়েতে তোমরা দুজনে কেউই সুখী হবে না।

আনন্দ। (মৃদু হাসিয়া) তুমি ধরা পড়ে গেছ রঞ্জন, চিত্রাকে তুমি ভালবাস—

রঞ্জন। সত্যিই তাকে আমি ভালবাসি আনন্দ। কিন্তু তুমি যে ভাবে ভালবাস, সে ভাবে নয়। তার ভেতরের চাপা গভীর দুঃখ আমায় অভিভূত করে ফেলেছে আনন্দ। বড় কষ্ট হয় তাকে—দেখলে—বড় মায়া হয়। (আনন্দর মুখের দিকে তাকাইয়া) কিন্তু তুমি তো আমার কথা বিশ্বাস করলে না—তোমার চোখে রয়েছে অবিশ্বাস। (আনন্দর হাত নিজের হাতের মধ্যে লইয়া) তোমাকেও আমি বড় ভালবাসি আনন্দ! তোমারও ভেতরে চাপা রয়েছে গভীর বেদনা—সে বেদনা আমি অনুভব করি বন্ধু।

আনন্দ। আশ্চর্য! যতক্ষণ তুমি আমার সামনে থাক, ততক্ষণ তোমার ওপর এক বিন্দুও রাগ থাকে না। কিন্তু এই ছ'মাস তুমি ছিলে না, প্রতি মুহূর্তে মনে হয়েছে, তোমাকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলতে

পারলে, তবে আমার শান্তি! এতক্ষণ তোমার কথা শুনছি রঞ্জন, মনে হচ্ছে তোমার প্রত্যেকটা কথা নির্ভুল ভাবে সত্য। কিন্তু তবু আমি তোমাকে নিজের বলে মনে করতে পারছি না রঞ্জন—কেবলি মনে হচ্ছে, তোমার আমার দৃষ্টি কোণ সম্পূর্ণ পৃথক্—

রঞ্জন। (মৃদু হাসিয়া) তুমি আমার ওপর বিরক্ত হয়ে উঠেছ আনন্দ!

আনন্দ। এ বিরক্তিবোধ অবশ্যম্ভাবী রঞ্জন! দেখছ না, তোমাতে আমাতে কত পার্থক্য? তোমার ভালবাসার মধ্যে আছে করুণা, মায়া, আর আমার ভালবাসার মধ্যে আছে ঘৃণা!

রঞ্জন। এ তোমার ভুল ধারণা আনন্দ, তা হলে চিত্রা তোমায় বিয়ে করতে রাজী হ'ত না!

আনন্দ। এ বিয়ে সম্বন্ধে তার কি ধারণা জান রঞ্জন? তার ধারণা সে পুরনো জুতো জোড়া ফেলে দিয়ে নতুন এক জোড়া জুতো পরছে। আর তুমি নিজেও তো জান? মনে নেই, এর আগের বার বিয়ের দিনেই সে তোমার কাছে পালিয়ে গিয়েছিল?

রঞ্জন। (ভীত স্বরে) কিন্তু আনন্দ, এই ঘৃণা, এই লজ্জা—এ সব জেনেও তুমি তাকে বিয়ে করবে?

আনন্দ। তা ছাড়া আমার কোন উপায় নেই রঞ্জন! লজ্জার কথা বলছ? তুমি জান না, কি লজ্জা সে আমায় দিয়েছে। আমারই সামনে আমার বন্ধু-বান্ধবদের ডেকে এনে তাদের সঙ্গে অশ্লীল রসিকতা করতে তার বাধে নি। এই সেদিন আমার সামনে অনিমেষের সঙ্গে বেরিয়ে গেল, সারা রাত বাড়ি ফেরে নি।

রঞ্জন। সে শোধ নিচ্ছে আনন্দ।

আনন্দ। শোধ নিচ্ছে?

রঞ্জন। হ্যাঁ। পৃথিবী তার কাছে যে অপরাধ করেছে, সেই অপরাধের শোধ সে তোমার ওপর নিচ্ছে।

আনন্দ। প্রথমে আমারও তাই মনে হয়েছিল। তাকে আমি বোঝাবার চেষ্টাও করেছিলাম। বলেছিলাম—অতীতকে ভুলে যাও চিত্রা, নতুন ভাবে তোমার আমার জীবন শুরু হ'ক।

রঞ্জন। কোন ফল হয় নি তাতে ?

আনন্দ। না। তখন আমি আর থাকতে পারি নি। বললাম—সে আসলে যে কি তা আর আমার জানতে বাকী নেই—

রঞ্জন। (কাতর স্বরে) ভুল করেছ আনন্দ—চিত্রাকে তুমি চিনতে পার নি, তাকে তুমি—

আনন্দ। (বাধা দিয়া) ভুল আমি করি নি রঞ্জন, আমি তাকে ঠিক চিনেছি। কিন্তু উত্তরে সে আমাকে কি বললে জান ?

রঞ্জন। (কাতর স্বরে) আর বলো না আনন্দ—তোমার এ ভ্রান্তির ইতিহাস আমি আর শুনতে পারছি না !

আনন্দ। (ক্রুর হাসিয়া) তবুও তোমাকে শুনতে হবে রঞ্জন ! উত্তরে সে আমায় বললে, এরপর তার বাড়ি এলে, সে অনিমেষকে দিয়ে আমার ঘাড় ধরে বাড়ি থেকে বার করে দেবে। আমি তখন কি করলাম জান ?

রঞ্জন। (দুই হাতে কান চাপিয়া ধরিয়া, কাতর স্বরে) শুনতে আমি চাই না আনন্দ !

আনন্দ। (রঞ্জনের কাঁধ ধরিয়া ঝাঁকানি দিতে দিতে) কিন্তু শুনতে তোমাকে হবেই রঞ্জন ! আমি তখন চাবুক দিয়ে—

রঞ্জন। দোহাই তোমার আনন্দ, এবার চুপ কর—

আনন্দ। (রঞ্জনের কথা গ্রাহ্য না করিয়া) আমি তখন চাবুক মেরে তার সর্বাঙ্গ কালো করে দিলাম—(ব্যাকুল স্বরে) কিন্তু তারপর রঞ্জন, তারপর ?

রঞ্জন। (আনন্দর হাত নিজের হাতের মধ্যে লইয়া, ধীর স্বরে) বল আনন্দ, তারপর ?

আনন্দ। (অশ্রুভারাক্রান্ত স্বরে) তারপর দু-দিন দু-রাত আমি ঘুমুতে পারি নি রঞ্জন! মনে হচ্ছিল কে যেন আমাকেই চাবুক মেরেছে! দু-দিন দু-রাত, আমি তার বিছানার পাশে বসে কাটিয়েছি—

রঞ্জন। এত বড় অপরাধ করেও তুমি তার কাছে ক্ষমা চাও নি আনন্দ?

আনন্দ। চেয়েছিলাম, কিন্তু পাই নি। শুধু তিন-দিনের দিন সকালে, কোথা থেকে ঘুরে এসে বললে—"যাও আনন্দ, বাড়ি যাও, বিয়ে আমি তোমাকেই করব। তুমি ইতর হলেও মানুষ, বাকীগুলো একেবারে জানোয়ার।"—এই আমার অবস্থা রঞ্জন—

রঞ্জন। এখন তোমার কি মনে হয়, আনন্দ?

আনন্দ। কিছু মনে হবার মত মন আমার এখন নয় রঞ্জন।

রঞ্জন। (অন্যমনস্ক ভাবে) তবে এক বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার। আমি তোমার পথে কোনদিনই কাঁটা হয়ে দাঁড়াব না।

আনন্দ। (ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া) তবে কিসের জন্যে তোমার এত আকুলতা? করুণা, মায়া—কি বল রঞ্জন?

রঞ্জন। তুমি আমায় বিশ্বাস করছ না আনন্দ?

আনন্দ। না না, বিশ্বাস আমি তোমায় করছি। কিন্তু তোমার ঐ করুণা, মায়া, এসব কি আমার ভালবাসার চেয়ে বড়?

রঞ্জন। তা বলতে পারি না। তবে তোমার প্রেম আর ঘৃণা, দুই মিলে এক হয়ে গেছে। প্রেমের পালা যেদিন শেষ হবে, সেদিন তুমি কি করবে আনন্দ?

আনন্দ। (পাঞ্জাবির তলা হইতে একটি বড় ছুরি বাহির করিয়া উত্তেজিত ভাবে) সেদিন—সেদিন আমি তাকে খুন করব রঞ্জন! (ছুরিটি টেবিলের উপর রাখিয়া দিল)

রঞ্জন। আমার সবচেয়ে কি অদ্ভুত লাগছে আনন্দ জান?

দুবার সে তোমাকে বিয়ের দিন ছেড়ে চলে এসেছে, আবার সে রাজী হ'ল কেন? তোমার টাকা দেখে নিশ্চয় নয়! আর তা ছাড়া তুমি হয়ত সত্যিই একদিন তাকে খুন করতে পার! (অন্যমনস্ক ভাবে ছুরিটির দিকে চাহিয়া দেখিতে দেখিতে) তবে হয়ত সে এইটাই চায়—একদিকে প্রেম—আর একদিকে ঘৃণা—

আনন্দ। জান রঞ্জন, একদিন সে আমাদের বাড়িতে এসেছিল। কথা বলতে বলতে হঠাৎ এক সময় আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—"আনন্দ তোমার মধ্যে একটা Cave man লুকিয়ে আছে। সে বড় Passionate, যখন কিছু চায়, বড় জোর করে চায়—না পেলে খুন করে ফাঁসীও যেতে পারে।" সেই ঘরে বাবার একটা বড় ছবি টাঙ্গানো ছিল। খানিকক্ষণ সে দিকে তাকিয়ে বললে—"কে বলেছিল তোমায় আমাকে ভালবাসতে? আজ যদি আমায় না ভালবাসতে, তাহলে তোমার বাবার মত ব্যবসা করে পৈতৃক সম্পত্তির পরিমাণ বাড়াতে পারতে—আজ আমায় যে রকম ভালবাস, সেই রকম ভালবাসতে টাকাকে।"

রঞ্জন। তারপর?

আনন্দ। তারপর আমার মার ঘরে ঢুকে মাকে প্রণাম করলে। বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে মার মাথা একটু খারাপ হয়ে গেছে। কারো সঙ্গে তিনি কোন কথা বলেন না। তাঁকে প্রণাম করে এসে আমায় বললে—"ওঁর মনে বড় দুঃখ আনন্দ, বিয়ের পর আমরা ওঁকে এখান থেকে নিয়ে চলে যাব।" জিজ্ঞেস করলাম—চলে যাবে কেন? উত্তরে সে বললে—"তোমার এখানে বড় অন্ধকার আনন্দ, এ অন্ধকারে আমরা থাকতে পারব না।"

রঞ্জন। (আগ্রহ পুর্ণ স্বরে) তাহলেই দেখ আনন্দ, সে বিশ্বাস করে তুমি তাকে ভালবাস। নইলে, সে তো জানে তুমি হয়ত

একদিন তাকে খুন পর্যন্ত করতে পার। এ সব জেনেও কি করে সে তোমাকে বিয়ে করতে মত দেয়, যদি না তোমার ভালবাসায় তার বিশ্বাস থাকে? জেনে শুনে কেউ কি মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায় আনন্দ?

আনন্দ। (রঞ্জনের মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া, ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া) ঠিক ঐ জন্যেই সে আমাকে বিয়ে করছে! আচ্ছা রঞ্জন, তুমি কি কিছু বোঝ না, এ সবের মূলে, কি তা কি তুমি সত্যিই জান না?

রঞ্জন। আমি তোমার কথা কিছু বুঝতে পারছি না আনন্দ?

আনন্দ। বোধ হয় সত্যিই কিছু বোঝ না—বোধ হয় লোকে তোমাকে যা বলে, তুমি সত্যিই তাই—তুমি নির্বোধ! (এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া) সে আর একজনকে ভালবাসে রঞ্জন—ঠিক আমি যেমন তাকে ভালবাসি, তেমনি। সে লোক কে জান? তুমি রঞ্জন—সে তোমাকে ভালবাসে—

রঞ্জন। (বিস্ময়ান্বিত হইয়া) আমাকে?

আনন্দ। (উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে) হ্যাঁ রঞ্জন, তোমাকে! পাছে তোমার জীবন সে বিষিয়ে দেয়, এই ভয়ে সে আমাকে বিয়ে করছে। হয়ত সে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করত—কিন্তু আমাকে সে বিষের চেয়ে ভয়ানক বলে মনে করে! নিজের প্রতি তার অসীম ঘৃণা, তাই সে আমাকে গ্রহণ করছে রঞ্জন।

রঞ্জন। (ছুরিটি লইয়া অন্যমনস্ক ভাবে নাড়াচাড়া করিতে করিতে) এ সব জেনেও তুমি তাকে—

আনন্দ। (বাধা দিয়া, কঠোর স্বরে) ওটা আমাকে দাও রঞ্জন (ছুরিটি গ্রহণ করিয়া কোমরে গুঁজিয়া রাখিল)

রঞ্জন। ওই ছুরি দিয়ে তুমি কি কর আনন্দ?

আনন্দ। (লঘু স্বরে) ও এই টে! তোমার কাছে আসবার

আগে একখানা বই পড়ছিলাম। বইটার কটা জোড়া পাতা এই ছুরি দিয়ে কেটেছি, তারপর ওটা সঙ্গেই রয়ে গেছে—

রঞ্জন। কিন্তু ছুরিটা নতুন, আর বেশ বড়ও—

আনন্দ। (ক্রুদ্ধ স্বরে) কেন, একখানা বড় নতুন ছুরিও কি আমার সঙ্গে থাকতে নেই?

রঞ্জন। (অন্যমনস্ক ভাবে) না না,—মানে—নিশ্চয় থাকতে পারে—নিশ্চয়—(হঠাৎ নিজেকে আয়ত্তের মধ্যে আনিয়া) না না আনন্দ—আমি ভুল করেছি, তুমি আমায় ক্ষমা কর বন্ধু।

আনন্দ। (উঠিয়া) আচ্ছা, তাহলে আমি এখন চলি রঞ্জন—

রঞ্জন। (উঠিয়া) এত তাড়াতাড়ি যাবে আনন্দ?

আনন্দ। হ্যাঁ রঞ্জন, এবার আমি যাব—আর থাকলে হয়ত নিজেকে (হঠাৎ দেয়ালে টাঙ্গানো ছবি তিনখানি দেখিয়া)—আচ্ছা রঞ্জন, তুমি ভগবানে বিশ্বাস কর?

রঞ্জন। ভগবানে বিশ্বাস করি কিনা সে কথা কোনদিন চিন্তা করে দেখি নি আনন্দ—(ছবি তিনখানির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া) তবে এঁদের মধ্যে অপরের জন্য যে বেদনা বোধ ছিল—আর শুধু এঁরা কেন—প্রত্যেক মানুষই অপরের জন্য বেদনা অনুভব করে—সে বেদনা বোধকে আমি শ্রদ্ধা করি আনন্দ! কিন্তু তোমার হাতে ওটা কি?

আনন্দ। (জামার পকেট হইতে একটি রাখি বাহির করিয়াছিল) এটা রাখি। আজ যে রাখিবন্ধনের দিন। বাড়ির সামনে একটা ছোঁড়া এটা আমার হাতে গুঁজে দিয়ে চার আনা পয়সা নিয়ে চলে গেল। (ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া) বোধ হয় আমার জন্যে সে বেদনা অনুভব করেছিল কি বল রঞ্জন।

রঞ্জন। সত্যিই তাই আনন্দ। রাস্তায় যারা রাখি বাঁধবার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকে, তাদের লক্ষ্য করে দেখেছ আনন্দ? তারা অনেকের

হাতেই রাখি বাঁধে, কিন্তু তবু সকলের হাতে বাঁধে না। ওরই মধ্যে থেকে বেছে নেয়.(আনন্দ রঞ্জনের হাত টানিয়া লইয়া রাখি বাঁধিয়া দিল)—কিন্তু একি আনন্দ ?

আনন্দ। কি জানি কেন আমার মনে হচ্ছে রঞ্জন, তুমি আমার ভাই, বন্ধু—মনে হচ্ছে তুমি আমার আমি। কিন্তু আর দাঁড়াব না রঞ্জন—নিজেকে আমার এতটুকু বিশ্বাস নেই—

রঞ্জন। চল তোমায় এগিয়ে দিয়ে আসি।

আনন্দ। (ব্যাকুল হইয়া) না না রঞ্জন, তুমি আমার সঙ্গে এস না! এই মুহূর্তে আমার মন বদলে যেতে পারে! সিড়ির পথটাও অন্ধকার—অন্ধকারে আমি নিজেকে এতটুকু বিশ্বাস করি না! (রঞ্জনের হাত ধরিয়া) বল তুমি আমার সঙ্গে আসবে না—বল—

রঞ্জন। (চেয়ারে বসিয়া শান্ত কণ্ঠস্বরে) বেশ আমি তোমার সঙ্গে যাব না আনন্দ—

আনন্দ। (হঠাৎ তাহার মুখের ভাব বিকৃত হইয়া উঠিল। মনে হইতেছিল সে যেন দারুণ যন্ত্রণা অনুভব করিতেছে) আমি তাকে তোমার হাতে দিয়ে গেলাম বন্ধু, তুমি তাকে গ্রহণ কর, সে তোমার—আনন্দকে মনে রেখ, সে চিত্রাকে তোমার হাতে দিয়ে গেছে—(হাত ছাড়াইয়া লইয়া দ্রুত দক্ষিণ পার্শ্বের দরজা দিয়া বহির হইয়া গেল)।

রঞ্জন। (উঠিয়া সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হইতে হইতে আকুল কণ্ঠ-স্বরে) আনন্দ—আনন্দ—

[নীচে আনন্দর কণ্ঠস্বর ক্রমশ মিলাইয়া যাইতেছে—"আমার পেছনে এস না বন্ধু, আমি নিজেকে বিশ্বাস করি না, আমি নিজেকে বিশ্বাস করি না।"]

রঞ্জন। আনন্দ—আনন্দ—ওঃ! বড় কষ্ট—বড় ব্যথা—(দুই

হাতে মাথা চাপিয়া ধরিয়া) বড় অন্ধকার হয়ে আসছে—আলো, একটু আলো—(চেয়ারে বসিয়া পড়িল) আলো—একটু আলো —(হঠাৎ রঞ্জনের মনে হইল, যেন সুমিত্রার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইতেছে)

সুমিত্রার কণ্ঠস্বর। এই তো আমি এসেছি রঞ্জন।

রঞ্জন। (তাহাকে দেখিয়া মনে হইতেছিল, সে যেন স্বপ্ন জগতের লোক। তাহার দৃষ্টি সম্মুখের দেয়ালের উপর নিবদ্ধ।) তুমি! তুমি সুমিত্রা!

সুমিত্রার কণ্ঠস্বর। হ্যাঁ আমিই তো তোমার আলো। তোমার চিঠি পড়ে তো ওই কথাই মনে হয়েছে আমার।

রঞ্জন। (তাহার মুখ এক অদ্ভুত হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল) সত্যিই তুমি আমার আলো সুমিত্রা,—তোমার কথা মনে হলেই কি জানি কেন, চারদিকের এই চাপা অন্ধকার দূরে সরে যায়।

সুমিত্রার কণ্ঠস্বর। হঠাৎ আমাকে কেন চিঠি লিখলে রঞ্জন—

রঞ্জন। কেন? তা তো ঠিক বলতে পারব না। ওয়াল্টেয়ারে চিত্রা যেদিন আমার কাছ থেকে চলে গেল, সেদিন তার কথা ভেবে মনে বড় কষ্ট হয়েছিল আমার। সেদিনও মনে হয়েছিল বড় অন্ধকার! হয়তো মূর্ছা যেতাম, কিন্তু হঠাৎ তোমার কথা মনে হ'ল। কোথায় গেল সে অন্ধকার—বড় হাল্‌কা মনে হল নিজেকে—বড় আনন্দ—তাইতো তোমায় লিখলাম—লিখলাম—

সুমিত্রার কণ্ঠস্বর। লিখেছিলে—"আমি যে কেন তোমায় চিঠি লিখছি, তা আমি নিজেই জানি না বন্ধু! আমি যে আছি এই কথাটা তোমাকে জানাতে ইচ্ছে করছে—এ ছাড়া তোমায় লেখবার বা বলবার মত আমার কিছু নেই। আমার মনের একান্ত কামনা—তুমি যেন সুখী হও। সত্যিই কি তুমি সুখী সুমিত্রা? ইতি—"রঞ্জন"

রঞ্জন। কিন্তু সুমিত্রা, আমার প্রশ্নের উত্তর ?

সুমিত্রার কণ্ঠস্বর। সে প্রশ্নের উত্তর এখনও পাও নি রঞ্জন—তাহলে কোন দিনও পাবে না। লোকে দেখছি নেহাৎ মিথ্যে বলে নি! তুমি সত্যিই নির্বোধ রঞ্জন—তুমি সত্যিই নির্বোধ--(সুমিত্রার কণ্ঠস্বর দূর হইতে দূরে মিলাইয়া গেল।)

চিত্রার কণ্ঠস্বর। আর আমার প্রশ্নের উত্তর রঞ্জন ?

রঞ্জন। (বিষাদ গম্ভীর কণ্ঠস্বরে) তুমি তো কোন প্রশ্ন কর নি চিত্রা ?

চিত্রার কণ্ঠস্বর। ওয়াল্টেয়ারে তিনদিনের দিন তোমার কাছ থেকে চলে এসেছিলাম—সেটাই তো আমার প্রশ্ন। সে প্রশ্নের উত্তর আজও আমি পাই নি রঞ্জন—

রঞ্জন। তোমার কোন কিছুই তো আমার কাছে প্রশ্ন নয় চিত্রা। তোমার দুঃখ আমার নিজের দুঃখ, তোমার ব্যথা আমার নিজের ব্যথা, চিত্রা!

চিত্রার কণ্ঠস্বর। (অশ্রুভারাক্রান্ত স্বরে) তাই তুমি আমায় করুণা কর রঞ্জন, তাই আমার প্রতি তোমার এত দয়া! কিন্তু তোমার মত নির্বোধের করুণা কে চায় বলতে পার ?—কে চায় তোমার মত নির্বোধের দয়া ? (চিত্রার কণ্ঠস্বর দূরে মিলাইয়া গেল)

রঞ্জন। (উঠিয়া, ব্যাকুল স্বরে) চিত্রা যেও না—যেও না—উঃ—এ কি অন্ধকার—

[নিঃশব্দ পদসঞ্চারে আনন্দর প্রবেশ]

আনন্দ। (রঞ্জনের বুকের উপর ছুরি তুলিয়া) অন্ধকার থেকে তোমায় মুক্তি দিতে এসেছি রঞ্জন—

রঞ্জন। কে আনন্দ ? (আনন্দের মুখের দিকে তাকাইয়া) বড় কষ্ট পাচ্ছ বন্ধু, না ?

আনন্দ। নিজের কথা চিন্তা কর রঞ্জন—আমি তোমাকে খুন করতে এসেছি—

রঞ্জন। আমাকে খুন করে শান্তি পাবে আনন্দ? তবে তাই কর!—(আকুল স্বরে) তোমার এ কষ্ট আমি আর দেখতে পারছি না, আমাকে মেরেই ফেল আনন্দ—তুমি আমাকে মেরেই ফেল—(রঞ্জনের কণ্ঠস্বর ক্রন্দনজড়িত, দুই চোখের কোণে আসিয়াছে অশ্রুবিন্দু।)

[আনন্দর ছুরি শুদ্ধ হাত আপনা হইতেই নামিয়া আসিল। এক মুহূর্তের জন্য রঞ্জনের মুখের দিকে তাকাইয়া কি যেন দেখিল। মুখের ভাব বিকৃত হইয়া উঠিল, মনে হইল, সে নিজে যেন কোন মতে উদ্‌গত অশ্রু রোধ করিতেছে। তারপর রঞ্জনকে ছাড়িয়া দিয়া নিঃশব্দ পদসঞ্চারে যেমন আসিয়াছিল, সেই ভাবেই বাহির হইয়া গেল।]

(আনন্দ চলিয়া গেলে রঞ্জন অবসন্নের ন্যায় মেঝের উপর বসিয়া পড়িল। কয়েক মুহূর্ত আচ্ছন্নভাবে কাটিবার পর কোন মতে নিকটবর্তী চেয়ারে উঠিয়া বসিল। মুখের ভাব রক্তলেশশূন্য—দেখা গেল আনন্দর গমন পথের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। বিমলেন্দু ও সুমিত্রার সহিত মিসেস রায় প্রবেশ করিলেন। ততক্ষণে রঞ্জনের আচ্ছন্ন ভাবটা কাটিয়া গিয়াছে। সে উঠিয়া স্মিত হাস্যে তিনজনকে অভ্যর্থনা করিয়া চেয়ারে বসিতে অনুরোধ করিল) সুমিত্রা ও মিসেস রায় বসিলেন, বিমলেন্দু দাঁড়াইয়া রহিল।]

মিসেস রায়। এই যে বাবা রঞ্জন, বিমলের মুখে শুনলাম তুমি ওয়াল্টেয়ার থেকে ফিরে এসেছ—

রঞ্জন। আজ্ঞে হ্যাঁ, কাল ফিরেছি—

মিসেস রায়। তা এখানে না উঠে, আমাদের ওখানে উঠলেই পারতে?

সুমিত্রা। তাতে ওঁর সম্মানবোধে বাধত মা,

মিসেস রায়। (রাগত ভাবে) কেন—বাধবে কেন শুনি? আমরা তো আপনার লোক—

রঞ্জন। (ব্যস্ত হইয়া) না না, সেজন্য নয়। আমি ভাবলাম আবার আপনাদের বিরক্ত করব—

সুমিত্রা। প্রথমবার তো সে কথা ভাবেন নি! ওভাবে কি কথা এড়ানো যায় রঞ্জনবাবু?

রঞ্জন। (মৃদু হাসিয়া) আপনি দেখছি আমার ওপর ভীষণ রেগে আছেন—

মিসেস রায়। না না, রেগে থাকবে কেন? ওর ওইরকম উল্টোপাল্টা কথা রঞ্জন। তুমি ওর কথায় কিছু মনে করো না বাবা।

সুমিত্রা। তুমি ভুল করছ মা—রাগতে গেলেও একটা সম্পর্ক থাকা চাই! ওঁর সঙ্গে আমাদের সে সম্পর্ক কোথায়? অবশ্য উনি যদি আলো-অন্ধকারের অজুহাত দিয়ে জোর করে একটা সম্পর্ক পাতিয়ে নিতে চান—তাহলে অবশ্য অন্য কথা। কি বল বিমলেন্দু?

মিসেস রায়। (রাগত ভাবে) দেখ সুমিত্রা, তোদের এসব হেঁয়ালিতে কথাবার্তা আমি মোটে বুঝতে পারি না!

সুমিত্রা। আমি হেঁয়ালিতে কিছু বলি নি মা। যাঁকে বলেছি, তিনি ঠিকই বুঝতে পেরেছেন—

মিসেস রায়। যাকগে ওসব কথা। (রঞ্জনকে) তা ওয়াল্টেয়ারে প্রায় মাস ছয়েক ছিলে, না রঞ্জন?

রঞ্জন। আজ্ঞে হ্যাঁ, তা প্রায় মাস ছয়েক হবে—

বিমলেন্দু। তা যাই বলেন মাসীমা, রঞ্জন বাবুর হেল্‌থ কিন্তু বেশ ইমপ্রুভ করেছে—

মিসেস রায়। হ্যাঁ। ছমাস আগে যা দেখেছিলাম, তার চেয়ে অনেক ইমপ্রুভ করেছে।

বিমলেন্দু। দেখ না সুমিদি, তুমি সেই রাজকুমারের ছবি আঁকবে বলেছিলে না—রঞ্জনবাবুকে মডেল করলে চলবে না?

মিসেস রায়। তার মানে? রাজকুমার! কোথাকার রাজকুমার?

সুমিত্রা। (ক্রুদ্ধ স্বরে) কোথাকার আবার, রূপকথার!

মিসেস রায়। (কঠোর স্বরে) রূপকথার রাজকুমার? তার সঙ্গে রঞ্জনের সম্পর্ক কি?

রঞ্জন। না না, আপনি ব্যস্ত হবেন না—ওঁরা হয়ত ঠাট্টা করছেন।

মিসেস রায়। না না, ঠাট্টারও একটা মানে হওয়া চাই (ধমকের সুরে) বিমলেন্দু!

বিমলেন্দু। আমি সত্যিই কিছু জানি না মাসীমা। একদিন আপনাদের বাড়ীতে গিয়ে দেখি, সুমিদি ইজেলের সামনে বসে গালে হাত দিয়ে কি যেন ভাবছে। জিজ্ঞেস করলুম, কি ভাবছ সুমিদি? বললে—"রূপকথার গল্পে এক রাজকুমারের কথা পড়ছিলাম। তার একটা ছবি আঁকতে ইচ্ছে করছে কিন্তু মডেল পাচ্ছি না।"

মিসেস রায়। (ব্যস্ত হইয়া) কই সুমিত্রা, আমাকে তো বলিস নি এসব কথা?

সুমিত্রা। (ক্রুদ্ধ স্বরে) তোমাকে আবার কি বলব মা! ও একটা রূপকথার গল্প—

মিসেস রায়। (রাগত ভাবে) আহা, সে গল্পটাই বা আমাকে বলিস নি কেন?

রঞ্জন। (মৃদু হাসিয়া) বলুন না মিস রায়—আমরাও শুনি, ওঁরও শোনা হবে—(দক্ষিণ পার্শ্বের দরজা দিয়া রায় ও সমর চৌধুরীর

প্রবেশ। সমরের বয়স আটাশ, পরিধানে দামী স্যুট। চেহারা সাধারণভাবে দেখিতে সুন্দর, কিন্তু বিশেষত্ব বর্জিত।)

রায়। (মিসেস রায়কে দেখিয়া) এই যে তোমরাও এসে পড়েছ দেখছি! তারপর রঞ্জন, কেমন আছ বল?

রঞ্জন। (চেয়ার হইতে উঠিয়া, হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া) আজ্ঞে ভালই আছি। বসুন—

[সমর ও রায় আসন গ্রহণ করিলেন]

রায়। (মিসেস রায়কে) পথে আসতে আসতে সমরের সঙ্গে দেখা। এস রঞ্জন, তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিই (রঞ্জনকে দেখাইয়া) রঞ্জন বসু—স্বর্গীয় কীর্তীনাথ রায়ের অর্ধেক সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী, আমাদের পরিবারের ঘনিষ্ঠদের মধ্যে একজন —একরকম আত্মীয় বললেই হয়। (সমরকে দেখাইয়া) সমরেন্দ্র নাথ চৌধুরী—আমার বিশেষ বন্ধু, বিখ্যাত কণ্ট্রাক্টর যোগেন্দ্রনাথ চৌধুরীর একমাত্র সন্তান। (সমর ও রঞ্জন পরস্পর পরস্পরকে নমস্কার করিল।)

সমর। আপনার কথা শুনে অবধি আপনার সঙ্গে আলাপ করবার ইচ্ছে হয়েছিল—কিন্তু সুযোগ হয়ে ওঠে নি—

রঞ্জন। আমি কিন্তু আপনার কথা শুনি নি—তবু মনে হয়েছিল, আপনার সঙ্গে আলাপ হলে বেশ হয়।

সমর। (ঈষৎ ইতস্তত: করিয়া)—মানে—আপনার কথাটা কিন্তু ঠিক বুঝলাম না—

রঞ্জন। মানে—আমি অনেক সময়, যাদের কখনও দেখি নি যাদের কখনও নাম শুনি নি, তাদের কথা ভাবি কি না। ভাবি, তাদের সঙ্গে আলাপ হ'লে কি রকম হয়। আপনি নিশ্চয় তাদের মধ্যে একজন।

সমর। মানে?

সুমিত্রা। (ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া) ওঁর সব কথার মানে আপনি আমি সব সময় বুঝতে পারবো না সমরবাবু!

মিসেস রায়। তোর সবতাতেই বাড়াবাড়ি সুমিত্রা! আমিও তো শুনলুম কথাটা। কই আমার তো মানে বুঝতে কোন কষ্ট হ'ল না! আমিও তো মাঝে মাঝে ভাবি ঐ সব লোকের কথা, যাদের কখন দেখি নি, যাদের নাম শুনি নি। ভাবি, তাদের সঙ্গে আলাপ হ'লে কি রকম হয়! তা যাকগে ওসব কথা, কই, তুই তো বললি না গল্পটা?

সমর। কি গল্প মিস রায়? আমরা শুনতে পাই না?

সুমিত্রা! নিশ্চয়ই পারেন। আপনি তো জানেন গল্পটা। সেদিন অত হাসাহাসি করলাম, আমি, আপনি, বিমলেন্দু, ঐ গল্পটা নিয়ে—

সমর। (হাসিয়া) ওঃ সেই গল্পটা! সে এক মজার গল্প—শুনবেন কাকীমা? (হঠাৎ রঞ্জনের দিকে চোখ পড়িতে) না—মানে গল্পটা একদম বাজে! ছেলে ভুলনো রূপকথার গল্প—কোন মানে হয় না।

মিসেস রায়। (অসহিষ্ণু স্বরে) তা হ'ক, তবু আমি শুনব! কই বলরে সুমি?

সুমিত্রা। (ছদ্মগাম্ভীর্যের সহিত, ব্যঙ্গ মিশ্রিত কণ্ঠ স্বরে) শুনবে একান্তই! আচ্ছা শোন তাহলে—মানসিক জড়তায় আচ্ছন্ন নির্বোধ এক রাজকুমার, হটাৎ সকলের কাছে দুর্বোধ্য হয়ে উঠল, এক স্বপ্ন দেখে। স্বপ্নে দেখল, এক মহীয়সী নারী তাকে প্রেরণা দিচ্ছেন। দুর হয়ে গেল তার সমস্ত মানসিক জড়তা। মনে হল এই নারীর সঙ্গে তার পরিচয় কত যুগ ধরে, কত কাল ধরে। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলে এঁর সেবায় সে জীবন উৎসর্গ করবে। তারপর একদিন শুনলে তার প্রেরণাদাত্রীর সমুহ বিপদ। কোন দিকে দৃকপাত না করে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল শত্রু ব্যূহের উপর। একা অসীম বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে সমস্ত

শত্রুকে বিতাড়িত করার পর, একবারও গেল না তার প্রেরণাদাত্রীর কাছে, একবারও জানালো না তাকে তার বীরত্বের ইতিহাস। নীরবে ফিরে এল সে তার প্রাসাদে। সেখানে একা থাকতে থাকতে, মানসিক জড়তা আবার তাকে আচ্ছন্ন করে ফেললে—পরিণত হল সে এক জড়, নির্বোধে। তারপর একদিন এই একাকীত্ব, এই মানসিক জড়তা—এরই মাঝে তার মৃত্যু হল। [সমরের মুখে ফুটিয়া উঠিল ব্যঙ্গের হাসি, রায় ও বিমলেন্দুকে খুবই লজ্জিত দেখাইতেছিল, রঞ্জনের বিমূঢ় অবস্থা। কেবল মিসেস রায় উৎসাহের সহিত বলিয়া উঠিলেন)

মিসেস রায়। বাঃ, বেশ চমৎকার গল্প তো সুমি। কোন্ বইতে আছে রে ?

সুমিত্রা। (সমরের ব্যঙ্গ মিশ্রিত হাসি, রঞ্জনের বিমূঢ় অবস্থা, এই সমস্তই তাহার লক্ষ্যে পড়িয়াছিল। বিরক্তি মিশ্রিত স্বরে) বললাম তো একবার! এ একটা রূপকথার গল্প—কার না কার মুখ থেকে শুনেছি—

সমর। আপনার মডেল বোধ হয় এতদিনে খুঁজে পেলেন, কি বলেন মিস রায় ?

সুমিত্রা। (যেন বুঝিতে পারে নাই এমন ভাবে) মডেল ? তার মানে ? ও মডেল। তা হবে! কিন্তু মডেলের কথা আমি মোটেই ভাবছি না সমরবাবু—আমি ভাবছি আপনার দুরবস্থার কথা।

সমর। (বিস্ময়ান্বিত হইয়া) আমার দুরবস্থার কথা—তার মানে ?

সুমিত্রা। দুরবস্থা নয়! এই দেখুন না, আপনাকে স্যুট পরলে মোটে মানায় না, আবার কাপড় পরলেও বিশ্রী দেখায়। আপনি যে কি পরে ভদ্র সমাজে বেরোবেন, সেটাই তো আমার কাছে একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। [সমরের মুখ লজ্জায় রক্তিম হইয়া উঠিল]

মিসেস রায়। (ক্রুদ্ধস্বরে) তুই কি কথাবার্তাও বলতে শিখিস নি সুমি! (রায়কে) দেখ মেয়েকে আদর দিয়ে কি তৈরী করেছ। (রায় আমতা আমতা করিয়া কি যেন বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু রঞ্জনের ভৃত্য সুরেনকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া থামিয়া গেলেন।)

সুরেন। কে দু'জন বাবু আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। জিজ্ঞেস করলুম, বললে—বল কীর্তিনাথ রায়ের ছেলে দেখা করতে এসেছেন।

রঞ্জন। (বিমূঢ় অবস্থায় উঠিয়া দাঁড়াইয়া বিমলেন্দুকে) কিন্তু আমি যে তোমার ওপর সমস্ত ভার দিয়েছিলাম বিমলেন্দু?

বিমলেন্দু। আমি ওদের সঙ্গে দেখা করেছিলাম, বোঝাবার চেষ্টাও করেছিলাম কিন্তু ওরা কারো কথা শুনতে রাজী নয়!

রঞ্জন। (সুরেনকে) আচ্ছা ওঁদের ওপরে পাঠিয়ে দাও। (সুরেনের প্রস্থান)

রায়। কীর্তিনাথের ছেলে? তার মানে? কীর্তিনাথের তো কোন ছেলে মেয়ে নেই।

সমর। (ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া) ব্যাপারটা কিন্তু আমারও মনে বেশ কৌতূহল জাগিয়ে তুলেছে। আপনি এ সপ্তাহের বার্তাবহ পড়েন নি?

মিসেস রায়। Black mail করার চেষ্টা!

সুমিত্রা। (রঞ্জনের নিকট গিয়া আবেগপূর্ণ স্বরে) ভালই করেছেন আপনি ওদের ডেকে এনে! এরা সকলে আপনাকে ছোট করবার চেষ্টা করছে—আপনি নিজেকে জানান—ওদের বুঝিয়ে দিন—(দক্ষিণ দিকের দরজা দিয়া হরিশ ও যতীনের প্রবেশ। হরিশ অত্যন্ত কৃশাকৃতি, যতীনের চেহারা সাধারণ, দু'জনেরই পোষাক—পরিচ্ছদে দারিদ্র্যের ছাপ! দুই জনেরই বয়স একুশ বাইশের মধ্যে।)

রঞ্জন। (উঠিয়া দুই জনকে নমস্কার করিয়া) আমি কিন্তু আশা করি নি আপনারা এখানে আসবেন। আমি বিমলেন্দুকে আপনাদের কাছে পাঠিয়েছিলাম।

যতীন। বিমলেন্দু বাবুর সঙ্গে আমাদের প্রয়োজন নয়, আমাদের প্রয়োজন আপনার সঙ্গে।

রঞ্জন। বেশ তো, আপনাদের যা বলবার আছে বলবেন। চলুন, পাশের ঘরে চলুন—এঘরে আমার বন্ধুবান্ধবেরা রয়েছেন।

হরিশ। (উদ্ধত ভাবে) আমরা কি আপনার বন্ধুবান্ধবদের ভয় করি! যা বলব, সকলের সামনেই বলব!

যতীন। আমরা কিছু ভিক্ষে চাইতে আসি নি! আমরা আমাদের ন্যায্য দাবি আদায় করে নিতে এসেছি!

রঞ্জন। বেশ আপনারা যদি এখানেই বলতে চান বলতে পারেন। আমার তাতে কোন আপত্তি নেই।

হরিশ। আমরাও তাই চাই! আমরাও চাই, সকলের সামনে এক মাতাল, চরিত্রহীন, ধনী, আর এক নির্বোধ জোচ্চোরের স্বরূপ তুলে ধরতে!

রঞ্জন। (গম্ভীর ভাবে) দেখুন গোড়াতেই যদি অত রেগে যান, তাহলে শেষ পর্যন্ত গুছিয়ে কিছু বলতে পারবেন না—এতগুলো লোকের সামনে আপনারাই নির্বোধ প্রতিপন্ন হবেন। তার চেয়ে যদি সহজভাবে আপনাদের বক্তব্য বলেন, সেটা ঢের বেশী কার্যকরী হবে বলে মনে হয়।

হরিশ। (উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে) আমাদেব বক্তব্য বিষয়—একাধারে বিখ্যাত ধনী, কুখ্যাত মাতাল আর চরিত্রহীন কীর্তিনাথ রায়ের অদ্ভুত খেয়ালের কথা! তিনি মরবার সময় তাঁর সমস্ত সম্পত্তি নিজের ছেলেকে বঞ্চিত করে, দিয়ে গেছেন এক নির্বোধকে! এক নির্বোধকে

তিনি প্রায় পথ থেকে কুড়িয়ে এনেছিলেন। বড় লোকের অনেকরকম বদ খেয়াল থাকে। তাঁরও একটা বদ খেয়াল হয়েছিল, ওই নির্বোধটাকে মানুষ করে তুলবেন। কিন্তু যখন দেখা গেল নির্বোধ শেষ পর্যন্ত নির্বোধই রয়ে গেল, তখন আর একটা বদ খেয়াল তিনি চরিতার্থ করে গেলেন। নিজের পুত্র-সন্তান থাকা সত্ত্বেও ওই নির্বোধকে তিনি অর্ধেক সম্পত্তি দান করে গেলেন। সেই নির্বোধ হচ্ছেন আপনি, আর যতীন হচ্ছে কীর্তিনাথ রায়ের নিজের ছেলে।

রঞ্জন। (শান্ত কণ্ঠস্বরে) আপনি বোধহয় হিসেবে একটু ভুল করে ফেলেছেন। প্রথমত: কীর্তিনাথ রায় মাতাল বা চরিত্রহীন, এ দুটোর কোনটাই ছিলেন না। দ্বিতীয়তঃ আমাকে তিনি পথ থেকে কুড়িয়ে পান নি, তিনি আমার পিতৃবন্ধু। তৃতীয়তঃ, কীর্তিনাথ রায় বিবাহ করেন নি, তাঁর কোন সন্তান ছিল না।

হরিশ। ওখানে আপনারই ভুল হয়েছে রঞ্জন বাবু! যৌবনে কীর্তিনাথ ছিলেন দুশ্চরিত্র আর মাতাল। সেই সময় তাঁর পরিবারে আশ্রিতা একটি মেয়ের ওপর তাঁর নেকনজর পড়ে। মেয়েটি সন্তানবতী হ'লে বদনামের ভয়ে তিনি কিঞ্চিৎ অর্থব্যয় করে, তাঁর অধীনস্থ এক কর্মচারীর সঙ্গে মেয়েটির বিয়ে দিয়ে দেন। কীর্তিনাথ কিছুদিন অর্থ সাহায্যও করেছিলেন, কিন্তু মেয়েটির স্বামী এই অসম্মানজনক সাহায্য নিতে রাজী হ'ন নি। কাজেই কীর্তিনাথ সাহায্য বন্ধ করেন, সেই সঙ্গে খোঁজ নেওয়াও! ইতিমধ্যে কীর্তিনাথের ছেলে, এই যতীনের জন্ম হয়, কিন্তু পৃথিবীতে সে পরিচিত হয় সেই কর্মচারীর সন্তান বলে। অসম্মানের বোঝা লাঘব করবার জন্যে সেই ভদ্রলোক তাঁর পরিবার-বর্গকে নিয়ে চাকরি ছেড়ে তাঁদের দেশে চলে যান। যতীনের যখন আঠারো বছর বয়স তখন তাঁর মৃত্যু হয়। দারিদ্র্য আর অভাবের বোঝা এসে পড়ে এই যতীনের ওপর। সুবিধাবাদী কীর্তিনাথ তাঁর

প্রণয়িনীর বা তাঁর ছেলের কোন খোঁজ রাখা দরকার মনে করেন নি। তিনি তাঁর বদখেয়াল চরিতার্থ করতে লাগলেন এক নির্বোধের পেছনে জলের মত অর্থব্যয় করে, আর শেষ খেয়াল চরিতার্থ করলেন, তাকে অর্ধেক সম্পত্তি দান করে! আমরা এই নির্বোধ অর্থাৎ আপনাকে সমস্ত কথা খুলে লিখেছিলাম। আমরা জানতাম আইনের মারপ্যাঁচে হয়ত আমাদের দাবি গ্রাহ্য হবে না। তবু আমরা আপনার বিবেকের ওপর নির্ভর করেছিলাম। কিন্তু আপনি এদিকে নির্বোধ হলে কি হয়, টাকা পয়সার ব্যাপারে আপনি বিবেক-রহিত, ইতর! আপনি আমাদের দাবি মিথ্যে বলে প্রত্যাখ্যান তো করলেনই, উপরন্তু আমাদের অপমান করলেন, পাঁচশো টাকা পাঠিয়ে! আপনি ভুলে গেলেন—যতীন আপনার কাছে ভিক্ষে চায় নি!

রঞ্জন। কিন্তু আপনি ভুল করেছেন হরিশবাবু। ও পাঁচশো টাকা আমি যতীন বাবুকে দয়ার দান হিসেবে দিই নি। ঠিক ঐ সময়ে আমার কাছে কিছু ছিল না—তাই আমি ঐ টাকাটা পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। ওয়ালটেয়ারে আপনাদের চিঠি পাওয়ামাত্রই আমি আপনাদের দাবি মেনে নিয়েছি। আমি ঠিক করেছি, আমার সম্পত্তির অর্ধেক আমি যতীন বাবুর নামে লেখাপড়া করে দেব—

মিসেস রায়। ওঃ, কি নির্বোধ!

রায়। সে কি রঞ্জন, কতকগুলো লোফারের কথা বিশ্বাস করে—

হরিশ। (ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত স্বরে বাধা দিয়া) ভদ্রভাবে কথা কইবার চেষ্টা করবেন মিঃ রায়।

রায়। ভদ্রলোক তোমরা নও—তোমরা লোফার—হুজ্জত করে কিছু টাকা আদায় করতে এসেছ।

হরিশ। তা যে নই, তা তো বেশ পরিষ্কার বুঝতে পারলেন।

আপনাদের অভিজাত নির্বোধটি যে আমাদের দাবি সত্য বলে মেনে নিয়েছেন!

রঞ্জন। হ্যাঁ দাবি আপনাদের সত্য, কিন্তু তার পেছনের ইতিহাসটা নয়।

যতীন। তার মানে?

রঞ্জন। কীর্তিনাথ তাঁর বন্ধুর ছেলে, মানে আমাকে সম্পত্তি দিয়ে গেছেন, এটা একটা accident। তাঁর স্নেহদৃষ্টি আমার পরিবর্তে আপনার ওপর পড়তে পারত, আপনি তাঁর বান্ধবীর ছেলে। মৃত্যুর কয়েক মাস আগে তিনি আপনার মার খোঁজ করেছিলেন, কিন্তু পান নি। কীর্তিনাথ রায়ের সম্পত্তি আমি যে অধিকারে পেয়েছি, সে অধিকার আপনারও আছে। কাজেই আপনার দাবিকে আমি সত্য বলে মেনে নিয়েছি। কিন্তু যে ইতিহাসের ওপর আপনি আপনার দাবিকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন, সে ইতিহাস সত্য নয়। আপনি কীর্তিনাথ রায়ের সন্তান নন। যৌবনে কীর্তিনাথ রায় একটি মেয়েকে ভালবেসেছিলেন। তাঁদের বিবাহের সমস্ত ঠিক, এমন সময় মেয়েটি আর তার বাবা কলেরায় মারা যান। মেয়েটির ছোট বোনটিকে কীর্তিনাথ নিজের কাছে নিয়ে আসেন—আর নিজে সমস্ত ব্যয় বহন করে তার বিবাহ দেন। এই মেয়েটিই আপনার মা। বিয়ে দেওয়ার পরও কীর্তিনাথ আপনার মায়ের খোঁজ খবর রাখতেন, মাঝে মাঝে অর্থ সাহায্যও করতেন—

যতীন। কিন্তু নরেন উকিল—

রঞ্জন। (বাধা দিয়া) নরেন উকিল আপনাদের যা বলেছে, সেটা বাজার গুজব মাত্র। গুজব রটেছিল, কীর্তিনাথ আপনার মায়ের সঙ্গে প্রণয়াসক্ত, আর আপনি সেই প্রণয়জাত সন্তান। এই গুজব রটার পর আপনার মায়ের ইচ্ছা অনুযায়ী তিনি আপনাদের বাড়ী যাতায়াত বন্ধ

করেন এবং ভবিষ্যতে কোনদিন সাক্ষাত করবেন না বলে প্রতিজ্ঞা করেন। সে প্রতিজ্ঞা তিনি আজীবন রক্ষা করেছিলেন।

হরিশ। (উত্তেজিত স্বরে) কক্ষনো না। নরেন উকিল প্রমাণ করে দিয়েছে, এ কথা সত্যি—সে প্রমাণ আমাদের কাছে আছে—

রঞ্জন। সে প্রমাণ মিথ্যে। সবচেয়ে বড় প্রমাণ যতীন বাবুর মা। আমি ওয়ালটেয়ার থেকে ফেরার পথে আপনাদের দেশের বাড়ীতে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলাম। তিনি বলেছেন, এসব কথার মধ্যে এতটুকুও সত্যি নেই। তিনি যে সব চিঠিপত্র আমার হাতে দিয়েছেন, সেগুলো পড়লেই বুঝতে পারবেন। নরেন উকিল আপনার মাকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন, আমার মত নির্বোধকে খোঁচা মারলেই কিছু টাকা আদায় হয়ে যাবে।

যতীন। কিন্তু আমি মাকেও চিঠি লিখেছিলাম—

রঞ্জন। কোন উত্তর পান নি, এই তো? পাছে কীর্তিনাথ রায়ের নামে মিথ্যে কলঙ্ক পড়ে, সেইজন্য তিনি নিজে আসছেন আপনাকে বুঝিয়ে বলতে—

(দ্রুতপদে রমেনের প্রবেশ)

রমেন। (যতীনকে একখানি চিঠি দিয়া) যতীনদা আপনার মা এসেছেন, মেসে আপনার ঘরে বসিয়েছি—

যতীন। (চিঠি গ্রহণ করিয়া) মা এসেছেন! কোনমতে আপন উত্তেজিত অবস্থা আয়ত্তের মধ্যে আনিয়া, শান্ত স্বরে) আচ্ছা রমেন, তুমি যাও—মাকে বল, আমি এখনি আসছি—(রমেন চলিয়া গেলে, (চিঠি পড়িয়া উত্তেজিত স্বরে) রঞ্জনবাবু আপনি যা বলেছেন, তাই ঠিক! মা লিখেছেন, নরেন উকিল মিথ্যে বলেছে—প্রমাণ তিনি নিজে—

রায়। (হরিশকে) একটু আগে ভদ্রলোক নও বলতে খুব চটে

গিয়েছিলে! ঘরের কেলেঙ্কারি ভাঙিয়ে টাকা নিতে আসতে লজ্জা করে নি তোমাদের? নিজেকে জারজ বলে পরিচয় দিতে এতটুকু লজ্জা করে নি?

হরিশ। (উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে) কিছুমাত্র না। কানীন গোত্রে লজ্জা কিসের? আপনাদের মত বড়লোকেরা ভুলিয়ে মেয়েদের সর্বনাশ করে থাকেন—লজ্জা হওয়া উচিত আপনাদের! হ্যাঁ যতীন ঐ টাকাটা—

যতীন। (পকেট হইতে একটি খাম বাহির করিয়া) আমি ভুলে যাচ্ছিলাম রঞ্জনবাবু, এই আপনার পাঁচশো টাকা—(খামটি টেবিলের উপর রাখিল)

রঞ্জন। (বাধা দিয়া) কিন্তু ও টাকা তো আমি ফেরৎ চাই নি যতীনবাবু—

যতীন। আপনি মহানুভব হতে পারেন, কিন্তু আমি ভিখিরী নই! আমার দাবির ভিত্তিতে যখন কোন সত্য নেই, তখন আপনার টাকার সঙ্গেও আমার কোন সম্পর্ক নেই!

রঞ্জন। (ব্যাকুল স্বরে) কিন্তু একদিক থেকে আপনার দাবি ন্যায্য। আপনি বিশ্বাস করুন, ও টাকা আমি আপনাকে দয়ার দান হিসেবে পাঠাই নি। আমি তো বলেছি, যে সম্পত্তি আমার কাছে এসেছে সে সম্পত্তি আপনারও হতে পারত! অর্ধেক কেন? আপনি সমস্ত সম্পত্তি গ্রহণ করুন যতীনবাবু! কেন করবেন না? সমান অধিকার রয়েছে আপনার এই সম্পত্তিতে।

যতীন। (ক্রুদ্ধ স্বরে) কেন বার বার সম্পত্তির কথা বলে অপমান করছেন আমাকে। আমি তো বলেছি, ভিক্ষে নিতে আমি আসি নি!

হরিশ। (ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া) বাঃ রঞ্জনবাবু বাঃ। আপনি

নির্বোধ হলে কি হয়, নির্বুদ্ধিতাকে নিজের কাজে কি করে লাগাতে হয়, তা আপনি বেশ ভাল করেই জানেন দেখছি! টাকা দেওয়ার প্রস্তাব এমনভাবে করলেন, যাতে সম্মানবোধ আছে এমন লোকের পক্ষে টাকা নেওয়া সম্ভব নয়। হয় আপনি সত্যিই নির্বোধ, আর নয়তো আপনার মত ধূর্ত বোধ হয় দুনিয়ায় বেশী নেই।

রঞ্জন। (ব্যাকুল স্বরে) যতীনবাবু, হরিশবাবু, আপনারা আমায় ভুল বুঝবেন না। আমি কি বলতে কি বলেছি—আপনারা —মানে যতীনবাবু—আপনি এই সম্পত্তি গ্রহণ করুন। এতে আমারও যে অধিকার, আপনারও সে অধিকার! কীর্তিনাথ রায় উইলে আপনার নাম করেন নি, এটা mere accident! আপনি তাঁর পুত্র না হলেও পুত্রস্থানীয়—

মিসেস রায়। একেবারে বদ্ধ পাগল।

সুমিত্রা। (ক্রুদ্ধস্বরে) এখানে পাগল কে নয় বলতে পার মা!

রায়। রঞ্জন, তুমি এত নির্বোধ।

সমর। আপনি আবার বলছিলেন ইনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছেন! He is still diseased!

বিমলেন্দু। (ইতিমধ্যে টেবিল হইতে খামটি তুলিয়া টাকা গুণিতেছিল) কিন্তু এতে তো মোটে চারশো টাকা রয়েছে—আর একশো টাকা?

রঞ্জন। (ব্যাকুল স্বরে) যা আছে, থাক না বিমলেন্দু, কেন গুণছ? (হাত যোড় করিয়া যতীন ও হরিশকে) আপনারা আমায় নির্বোধ বলে ক্ষমা করে নিন! আমায় নির্বোধ বলে ক্ষমা করে নিন!

হরিশ। হঁ্যা হঁ্যা, আমরা জানি ওতে একশো টাকা কম আছে—কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না!

রঞ্জন। না না, সত্যিই ওতে কিছু এসে যায় না—

রায়। কিছু এসে যায় বই কি রঞ্জন!

হরিশ। (বাধা দিয়া) না, কিছু এসে যায় না! টাকাটা এখানে বড় কথা নয়! বড় কথা ফেরত দেবার ইচ্ছেটা, বড় কথা—আমরা আপনার দয়ার দান গ্রহণ করি নি! টাকা নেবার ইচ্ছে থাকলে ও চারশো টাকাও আমরা ফেরত দিতাম না—

যতীন। (ক্রুদ্ধ স্বরে) বাকী একশো টাকাও আমি ফেরত দিয়ে দেব—

হরিশ। নিজেরা না পারি, বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে চাঁদা তুলব! মাসে যদি এক টাকা করেও হয়, তাও সই!

যতীন। শুধু ঐ একশো টাকা কেন, ওর যা স্থদ হয় তাও দিয়ে দেব—

হরিশ। যতীনের অভাব বলেই টাকাটা খরচ হয়ে গেছে। যতীনের কোন পিতৃবন্ধু যতীনকে নির্বোধ ভেবে কোটি খানেক টাকা দিয়ে যান নি! নরেন উকিল বলেছিল যতীনের জয় নিশ্চিত—তাই না যতীন টাকাটা খরচা করে ফেলেছে! এ অবস্থায় কে না খরচ করত—?

সমর। (ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া) এদের যুক্তি শুনে আমার কিন্তু একটা গল্প মনে পড়ে গেল। একবার একটা লোক ডাকাতি করতে গিয়ে ছটা লোককে খুন করে। তার উকিল কোর্টে তার হয়ে বলে—"লোকটা গরীব বলেই ডাকাতি করতে গিয়ে ছটা খুন করেছে। তার মত অবস্থায় পড়লে, কে না করত ছটা খুন?"

মিসেস রায়। (তাঁহাকে অত্যন্ত উত্তেজিত দেখাইতেছিল) তুমি থাম সমর—অনেক হয়েছে—(আরও কি যেন বলিতে যাইতে-ছিলেন)

রায়। (মিসেস রায়ের একটি হাত ধরিয়া) চল, এবার আমরা যাই—

মিসেস রায়। (এক ঝটকায় হাত ছাড়াইয়া লইয়া) থাম, অনেক হয়েছে! এতক্ষণ এ কথাটা মনে পড়ে নি?—এই নির্লজ্জতা, এই অপমান—এ সব দেখেও এতক্ষণ আমাদের নিয়ে যাবার কথাটা মনে হয় নি?

রায়। (মৃদু হাসিয়া) এতক্ষণ নিয়ে যেতে চাইলেও তুমি যেতে না অপর্ণা—

মিসেস রায়। (উত্তেজিত অবস্থায়) কেন—জোর করে নিয়ে যেতে পার নি? এখন যখন অপমানের চূড়ান্ত হ'ল, তখন উনি এসেছেন এখান থেকে আমায় নিয়ে যেতে! এখন আমরা নিজেরাই এখান থেকে যেতে পারব। চলে এস সমর—চল্ সুমি—(সুমিত্রাকে রঞ্জনের সহিত কথা কহিতে দেখিয়া)—তুই ওই নির্বোধটাকে কি বোঝাতে চেষ্টা করছিস শুনি? ও সব বুঝে বসে আছে! দেখছিস না, ওই অসভ্য ছেলেদুটোর হাতে পায়ে ধরে ক্ষমা চাইছে—ওদের মিনতি করছে, ওর সম্পত্তি গ্রহণ করে ওকে উদ্ধার করবার জন্যে।—

যতীন। (ক্রুদ্ধ স্বরে) আপনি আমাদের সম্বন্ধে ভুল ধারণা করছেন—

মিসেস রায়। (উত্তেজিত অবস্থায়) ঠক্, জোচ্চোর! একটা নির্বোধকে ঠকিয়ে টাকা নিতে এসেছ—কথা বলতে লজ্জা করে না তোমাদের! (মুখ বিকৃত করিয়া) আমাদের সম্বন্ধে ভুল ধারণা করেছেন! কিছু ভুল ধারণা করি নি। ও জোড় হাত করে তোমাদের কাছে ক্ষমা চাইছে! তোমরা তো জান, ওকে ক্ষমা করবে না, এই তো? করবে কেন—ক্ষমা করবার তো দরকার নেই! তোমরা তো জান, ও সম্পত্তি তোমাদের হাতের মুঠোর মধ্যে এসে গেছে। আজ

তোমরা ওকে ক্ষমা করবে না, কাল ওই নির্বোধটা তোমাদের বাড়ীতে ক্ষমা চাইতে যাবে! যাবে না রঞ্জন? বল—চুপ করে রইলে কেন? যাবে না তুমি ওদের বাড়ী ক্ষমা চাইতে?

রঞ্জন। (বিষাদ গম্ভীর স্বরে) ওঁরা এখানে এসে অপমানিত বোধ করেছেন। ওঁদের ক্ষমা আমায় পেতেই হবে—তার জন্যে যদি ওঁদের বাড়ীতে যেতে হয় তাও আমি যাব—

মিসেস রায়। (যতীন ও হরিশকে) কি, আমি বলেছি না, তোমাদের আর বৃথা বাক্যব্যয়ের প্রয়োজন হবে না। ও টাকা তোমাদের হাতের মুঠোর মধ্যে এসে গেছে। তোমাদের বুঝতে আমার কিছু বাকী নেই! এই যে সমর এইমাত্র একটা খুনের গল্প বললে, তার সঙ্গে তোমাদের তফাৎ কোথায় বলতে পার? তবে তোমরা অভাবের জন্যে করবে না, তোমরা করবে তোমাদের নীতি বজায় রাখবার জন্যে! কিন্তু কাজটা সেই একই—নরহত্যা! কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বলবে, তোমরা তোমাদের নীতি বজায় রাখতে গিয়ে খুন করতে বাধ্য হয়েছ! প্রবল নীতি-জ্ঞান তোমাদের, ন্যায়ের অবতার তোমরা! কিন্তু জিজ্ঞেস করি খবরের-কাগজে এই নির্বোধটাকে নিয়ে ঠাট্টা করতে তোমাদের এতটুকু বাধে নি? নীতি বজায় রাখবার জন্যে তোমরা রঞ্জনের সম্পত্তি নিতে এসেছ—তোমরা তোমাদের দাবি আদায় করতে এসেছ, ভিক্ষে চাইতে আস নি! কই এটা তো মনে হয় নি তোমাদের, কীর্তিনাথ হয়ত তাঁর নীতি বজায় রাখবার জন্যেই সমস্ত সম্পত্তি রঞ্জনকে দিয়ে গেছেন? রঞ্জনের তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবার কোন প্রয়োজন নেই! কিন্তু কাকেই বা বলছি এ সব কথা! তোমরা বেশ ভাল করেই জান, রঞ্জন কীর্তিনাথের কাছে কৃতজ্ঞ—আর সেই কৃতজ্ঞতার সূত্র ধরেই তোমরা এখানে টাকা চাইতে এসেছ। (রঞ্জনের দিকে দেখাইয়া) আর নির্বোধটার দিকে চেয়ে দেখ—কোন চৈতন্য নেই

তার! সে ঠিক যাবে তোমাদের কাছে ক্ষমা চাইতে। যাবে না তুমি? কি কথা বলছ না যে—যাবে না তুমি ওদের কাছে ক্ষমা চাইতে?

রঞ্জন। বলেছি তো, ওঁদের কাছে ক্ষমা আমায় চাইতেই হবে। দুঃখ আর অভাবের চাপে পড়েই বার্তাবহ কাগজে ওঁরা আমায় নিয়ে কৌতুক করেছিলেন। বড় কষ্টের মধ্যে আছেন বলেই নিজের মার নামে কলঙ্ক কাহিনী অতি সহজে বিশ্বাস করেছিলেন। ওঁদের সে কষ্ট আমি প্রথমে অনুভব করতে পারি নি। সে অপরাধের ক্ষমা আমায় পেতেই হবে ওঁদের কাছ থেকে—

মিসেস রায়। (ক্রোধকম্পিত কণ্ঠস্বরে) তবে জেনে রাখ রঞ্জন, তোমার সঙ্গে আজ থেকে আমাদের কোন পরিচয় নেই। মনে করব, রঞ্জন বলে কাউকে আমরা কোনদিন চিনতাম না, জানতাম না। (হরিশকে মৃদু হাসিতে দেখিয়া, ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়া সেইদিকে অগ্রসর হইলেন) হাসতে তোমার এতটুকু লজ্জা করে না ইতর, ঠক্!

সুমিত্রা। (মিসেস রায়ের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে) মা— কি করছ কি—

রায়। অপর্ণা—অপর্ণা—

সমর। কাকীমা!

হরিশ। (পূর্ববৎ মৃদু হাসিতে হাসিতে, ক্লান্তস্বরে) আপনারা মিথ্যে ব্যস্ত হচ্ছেন। আমি জানি উনি আমায় আঘাত করতে পারেন না— উনি আমায় আঘাত করতে পারেন না—উনি আমায় আঘাত করতে পারেন না—

(দেখা গেল হরিশের সর্বাঙ্গ কাঁপিতেছে। মিসেস রায় তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া মুহূর্তের জন্য থমকাইয়া দাঁড়াইলেন, তাহার পর হরিশকে ধরিয়া ফেলিলেন। তিনি না ধরিলে বোধ হয় সে পড়িয়া যাইত।)

মিসেস রায়। (হরিশের গায়ে হাত ঠেকিতেই তিনি শিহরিয়া উঠিলেন) উঃ—এ কি, এ যে অনেক জ্বর!

হরিশ। তাই তো বলছিলাম—আপনি আমায় আঘাত করতে পারেন না। আমি তো জ্যান্ত নই—অনেক দিন হল আমি মরে গেছি! মরাকে কেউ কি আঘাত করতে পারে?

মিসেস রায়। (হরিশকে চেয়ারে বসাইয়া, নিজে তাহার পাশে বসিয়া, তাহার গায়ে মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন) আমাকে ক্ষমা কর বাবা, তুমি যে অসুস্থ, তা আমি বুঝতে পারি নি—

হরিশ। (ক্লান্ত স্বরে) আপনার তো কোন দোষ নেই। আমি তো আপনাদের কাউকে বুঝতে দিই নি।

যতীন। (রঞ্জনের নিকট আসিয়া) আমি চলি রঞ্জনবাবু। ক্ষমা আমি আপনার কাছে চাইব না, কেন না, দোষ আমি কিছু করি নি। তবে মিথ্যে কথা সত্যি বলে বিশ্বাস করেছিলাম, তার জন্যে আমি অনুতপ্ত (হঠাৎ মিসেস রায়ের নিকটে আসিয়া) আপনার অনেক দয়া, হরিশকে একটু দেখবেন—ওর কেউ নেই, চার বছর ধরে ভুগছে—(তাহার চোখে জল আসিয়া পড়িল)—আর বোধ হয় বেশী দিন—(আর বলিতে পারিল না, প্রণাম করিয়া দক্ষিণ দিকের দরজা দিয়া দ্রুত বাহির হইয়া গেল)।

মিসেস রায়। শোন—শোন বাবা যতীন—শুনে যাও—

হরিশ। আপনি মিথ্যে ওকে ফেরাতে চেষ্টা করছেন, ও আর ফিরবে না। দেখলেন না, যাবার আগে ওর মুখ কি রকম লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছিল। নিজের মার নামে কলঙ্ক-কাহিনী ও নিজে কাগজে বের করেছে—তার একটা লজ্জা নেই! কিন্তু ও ওর মাকে সত্যিই ভালবাসে। কাগজে যা প্রকাশ করেছে তা ও সত্যি বলেই বিশ্বাস করেছিল। তাই ত ছুটে গেল ওর মার কাছে মাফ চাইতে—

নিজের অপরাধের বোঝা উজাড় করে দিতে। আপনারা শুধু বাইরেটাই দেখেন। ভেতর যেমনই হক না কেন, বাইরেটা পরিচ্ছন্ন হলেই তাকে আপনাদের সমাজের গেট পাশ দিয়ে দেন। যতীনের ভেতর বড় পরিষ্কার, বড় সাদা, বড় বেশী আত্মসম্মান জ্ঞান ওর।—(রঞ্জনের দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে) এই যদি গিয়ে শোনে আপনি ওর মাকে অর্থ সাহায্য করে এসেছেন, তাহলে আপনারই কাছে ছুটে এসে জিজ্ঞেস করবে, কোন্ স্পর্ধায় আপনি ওর মাকে অপমান করতে সাহস করেছেন।—(জোরে হাসিতে হাসিতে) কেমন ঠিক বলি নি রঞ্জনবাবু? ওয়াল্টেয়ার থেকে ফেরার পথে আপনি ওর মার হাতে টাকা দিয়ে আসেন নি? কেমন ঠিক বলি নি—হাঃ হাঃ হাঃ—(উন্মত্তের মত হাসিয়া চলিল)

রঞ্জন। (ব্যাকুল ভাবে) সত্যিই আমি অপরাধ করেছি হরিশবাবু।—যতীনবাবু এখানে নেই, তার বদলে আপনার কাছে আমি মাফ চাইছি। (নিকটে অগ্রসর হইয়া আসিতে আসিতে) শুধু আপনি শান্ত হন—(রঞ্জনকে দেখিয়া মনে হইতেছিল, হরিশের রোগ যন্ত্রণা যেন সে নিজেই ভোগ করিতেছে) দয়া করুন হরিশবাবু—শান্ত হন—(হরিশের হাসি থামে নাই) হরিশবাবু আপনি উত্তেজিত হবেন না—হরিশবাবু—হরিশবাবু—(হরিশ তখনও হাসিয়া চলিয়াছে)

মিসেস রায়। অশ্রুভারাক্রান্ত কণ্ঠস্বরে) হরিশ, চুপ কর বাবা, তোমার বড় কষ্ট হচ্ছে—তোমার অসুখ বাড়বে—

হরিশ। (তখনও কথার মধ্যে হাসির অল্প রেশ আছে) কিছু কষ্ট হবে না মা—রোগ যেটুকু বাড়বার তা বেড়েই গেছে—এর বেশী আর বাড়তে পারবে না—(হঠাৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া) তোমাকে মানে—আপনাকে ভুল করে—না না, ভুল আমি করি নি! ছোটবেলায় মাকে হারিয়েছি, তবু আমার পরিষ্কার মনে আছে। আমার মাও ছিলেন

আপনারই মত বদরাগী, আপনারই মত খেয়ালী, আপনারই মত কোমল—(মিসেস রায় থামাইবার চেষ্টা করিলেন) না না, আমাকে বলতে দাও মা—কথা বলতে না পারলে আমার কষ্ট আরও বাড়বে। আজ চার বছর আমি এক যতীন ছাড়া আর কারও সঙ্গে কথা বলি নি! আজ চার বছর আমি বিছানায় শুয়ে!—ক্ষয়রোগ মানে, রাজরোগ। আমার ঘরের জানালা খুললে দেখা যায় একটা ভাঙ্গা পাঁচিল। শুধু একটা ভাঙ্গা পাঁচিল। মাঝে মাঝে ঘরে পায়চারি করে বেড়িয়েছি, আর ভাঙ্গা পাঁচিলটার দিকে তাকিয়েছি—ঐটুকুই ছিল আমার একমাত্র বিলাস! রঞ্জনবাবু মিথ্যে মিনতি করছেন, চুপ আমি করব না! চার বছর কাটিয়েছি একটা ঘরের মধ্যে! দুনিয়ার আলো হাওয়ার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। রাগ হয়েছিল এই দুনিয়াটার ওপর, হিংসে হ'ত যতীনকে! আমিই যদি ভোগ করতে না পেলাম, তবে কিসের জন্যে এই আলো, কিসের জন্যে এই হাওয়া? নিভে যাক, মুছে যাক, অন্ধকার হয়ে যাক সব! তাইতো আজ বেরিয়ে এসেছিলাম যতীনের সঙ্গে। ভেবেছিলাম যে জ্বালায় জ্বলছি, সেই জ্বালায় দুনিয়াটাকে পুড়িয়ে ছাই করে দেব!—ভেবেছিলাম প্রত্যেক লোককে ডেকে জানিয়ে দেব—তারা যে অটুট স্বাস্থ্য ভোগ করছে এ একটা প্রচণ্ড অন্যায়! ভেবেছিলাম সূর্যকে জিজ্ঞেস করব, কেন এই চাঁদের আলো, কেন এই ছোট ছোট তারা? কিন্তু কিছুই জিজ্ঞেস করা হল না। রাগের সমস্ত চোটটা এসে পড়ল রঞ্জনবাবুর ওপর। কেন এই নির্বোধটা আমার দুঃখ, আমার বেদনা, এত গভীর ভাবে অনুভব করবে? কেন? কেন? কেন, আর পাঁচজনের মত আমাকে দেখে, একটু মিথ্যে সহানুভূতি জানিয়ে চলে যাবে না? আজ যখন নিশ্চিত মৃত্যু আমার সামনে তখন জানতে পারলুম অন্তত একজনও আছে, যে আমার জন্যে বেদনা অনুভব করে। আজ জেনে আমার

লাভ? চার বছর আগে আসতে পারে নি ওই নির্বোধটা, ওর বেদনা-বোধ নিয়ে?

রঞ্জন। (হরিশের দুটি হাত নিজের মধ্যে লইয়া, স্নিগ্ধস্বরে) ভুল হরিশবাবু—ভুল করেছেন আপনি! মানুষ মাত্রেই মানুষের জন্যে বেদনা অনুভব করে! এ ঘরের সকলেই আপনার দুঃখে দুঃখী। কত ভালবাসা, কত স্নেহ, এই মানুষের মধ্যে! শুধু অবস্থার সীমাবদ্ধতা, পরিবেশের সঙ্কীর্ণতা, প্রকাশের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। শুধু এঁরা কেন? পরিচিত, অপরিচিত, পৃথিবীর যে যেখানে আছে সকলেরই মনের তারে ঘা দিয়েছে আপনার এই দুঃখ, এই বেদনা।

হরিশ। (তিক্ত কণ্ঠস্বরে) ছিঃ রঞ্জনবাবু! আপনিও সাধারণের মত মিথ্যে বলে আমায় ভোলাতে চেষ্টা করছেন?

রঞ্জন। (ব্যাকুলভাবে) একটুও মিথ্যে বলি নি। এখান থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে, আজ যে লোক উৎসবে মেতে রয়েছে, সেও হঠাৎ এক সময়, কি জানি কি এক দুঃখে বিষাদ-গম্ভীর হয়ে উঠবে। পৃথিবীর যে যেখানে আছে সকলের মনের ব্যথা সে সেই মুহূর্তে অনুভব করবে। আপনার বেদনা, আপনার দুঃখও মিলিয়ে থাকবে সেই মুহূর্তের মাঝে!

হরিশ। মিথ্যে কথা। আমার দুঃখ নিয়ে পৃথিবীতে আমি একা—

রঞ্জন। (দৃঢ় প্রত্যয়ের সুরে) না, আপনি একা নন! আপনি জানেন না হরিশবাবু, মানুষ বড় স্নেহশীল, বড় দয়া তার। আপনি হয় তো বললে বিশ্বাস করবেন না, আজ থেকে বছর দুয়েক আগে যখন আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় পর্যন্ত ছিল না, তখনও আপনার বেদনা আমি অনুভব করেছিলাম। আজ থেকে বছর দুয়েক আগে প্রথম যেদিন মনে হল আমি রোগ মুক্ত, সেদিন প্রথমে পুলকে মন ভরে

উঠেছিল, পরে নেমে এল এক গভীর বিষাদের ভার। পরে বুঝেছি ঐ গভীর দুঃখানুভূতিই আমার রোগ মুক্তির প্রথম নিদর্শন। পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষের মনের গোপন কোণে, যেখানে যেটুকু দুঃখ ছিল সমস্ত এসে গভীর করে তুলল আমার মনের বেদনাকে। বুঝলাম আমি সত্যিই প্রত্যেকটি মানুষের আত্মীয়—বুঝলাম সত্যিই আমি মানসিক জড়তা থেকে মুক্তি পেয়েছি। পৃথিবীর প্রত্যেকের দুঃখ, প্রত্যেকের বেদনা, মিশে গিয়েছিল আমার বেদনার মধ্যে। সেদিনের সেই ব্যথা, সেই বেদনার মধ্যে ছিল, আপনার দুঃখ, মিসেস রায়ের দুঃখ, চিত্রার দুঃখ—

হরিশ। মিথ্যে কথা! পৃথিবী বড় কঠোর—সে কঠোরতার সঙ্গে পরিচয় নেই বলেই তুমি কাণ্ডজ্ঞানহীন নির্বোধ। প্রকৃতির কাছ থেকে চরম আঘাত পেয়েছিলে, তাই আর প্রকৃতিকে ঘাঁটাতে সাহস করছ না! তুমি coward! তুমি surrender করেছ রঞ্জন, কিন্তু আমি করি নি। শেষ দিন পর্যন্ত বলে যাব, এ পৃথিবীতে দয়া নেই, মায়া নেই—বড় কঠোর, বড় নিষ্ঠুর! আত্মহত্যা করে নিজেকে শেষ করে দিতাম। কিন্তু কেন দিই নি জান? জানি যে রোগে আমায় ধরেছে, তাতে আমার মৃত্যু নিশ্চিত—তবু যে কটা দিন বেঁচে থাকি, প্রাণভরে মানুষকে গালাগাল দিয়ে যাব—প্রাণভরে গালাগাল দিয়ে যাব—(বলিতে বলিতে উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনে ভাঙ্গিয়া পড়িল)

(মিসেস রায় হরিশকে কোলের মধ্যে টানিয়া লইলেন। এমন সময় দক্ষিণ দিকের দরজার পাশে চিত্রাকে দেখা গেল। প্রথম কেহই লক্ষ্য করে নাই। পরে তাহার কণ্ঠস্বরে সকলেই সচকিত হইয়া সেই দিকে তাকাইলেন।)

রঞ্জন। এ কি চিত্রা!

চিত্রা। হ্যাঁ রঞ্জন আমি। কিন্তু তোমার কাছে আসি নি, এসেছি সমরের কাছে।

সমর। (হতচকিত অবস্থা) আমার কাছে? কিন্তু আমি তো তোমাকে—মানে—আপনাকে—

চিত্রা। চেন না—এই তো! রাতের পর রাত আমার বাড়ীতে স্ফূর্তি করেছ—একটা রাতের কথাও তোমার মনে নেই? হ্যাণ্ডনোট লিখে টাকা ধার করেছ, সেগুলোর কথাও কি ভুলে গেলে?—আজ রাতে আসা চাই কিন্তু!—ও আজ আসতে পারবে না? বেশ তো কাল—আসা কিন্তু চাই-ই চাই! নইলে হ্যাণ্ডনোটের কথা লোকের মুখে মুখে ফিরবে—আচ্ছা আমি চললুম—এস কিন্তু।

সমর। কে তুমি?—কিসের হ্যাণ্ডনোট?—তোমায় তো আমি চিনি না—(ততক্ষণে চিত্রা দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গিয়াছে)—শোন, শুনে যাও—আপনারা কেউ চেনেন ওকে—(মিসেস রায়কে তাহার দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকাইতে দেখিয়া) বিশ্বাস করুন কাকীমা, আমি এর বিন্দু-বিসর্গও জানি না। (রঞ্জনের নিকট আসিয়া) রঞ্জনবাবু, আপনি কিছু জানেন? চেনেন ঐ মেয়েটিকে?

রঞ্জন। মেয়েটিকে চিনি। কিন্তু বিশ্বাস করুন সমরবাবু, এ ব্যাপারের কিছুই আমি জানি না।

মিসেস রায়। (রায়কে) আর কতক্ষণ আমায় এখানে থাকতে হবে বলতে পার?

রায়। আমি তো কখন থেকে বলছি—তুমিই তো যেতে রাজী হচ্ছ না—

মিসেস রায়। (হরিশকে দেখাইয়া) বেশ, তাহলে একে নীচেয় নামিয়ে নাও—

রায়। ও কোথায় যাবে?

মিসেস রায়। কোথায় আবার যাবে। যাবে আমাদের সঙ্গে, আমাদের বাড়ীতে।

রায়। কিন্তু বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া কি ঠিক হবে? হস্‌পিটাল রয়েছে—

মিসেস রায়। কেন ঠিক হবে না শুনি? বাড়ী আমাদের মস্ত বড়। দুজন নার্স রেখে ওর সমস্ত ব্যবস্থা আলাদা করে দেওয়া হবে। আমি নিজে দেখা-শুনো করতে পারব।

রায়। কিন্তু—

মিসেস রায়। সে হয় না। আমি ওকে ফেলে যেতে পারব না। বড় নির্যাতন, বড় কষ্ট পেয়েছে ও! আমার কাছে এলে মা-হারা জীবনে একটুও শান্তি হয়ত পাবে!

রায়। মিসেস রায়ের মুখের দিকে তাকাইয়া বুঝিলেন তিনি দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ) বেশ তবে তাই নিয়ে চল—আচ্ছা তাহলে চলি রঞ্জন। (রায় বাহির হইয়া গেলেন)

মিসেস রায়। বিমলেন্দু বাবা, হরিশকে একটু ধরে নামিয়ে দাও তো—কই সমর এগিয়ে এস, ধর একে—

সমর। (অগ্রসর হইয়া আসিতে আসিতে) বিশ্বাস করুন, কাকীমা—

মিসেস রায়। (বাধা দিয়া) বিশ্বাস অবিশ্বাসের বিচারটা পরে করলেও চলবে সমর—আপাতত একে আর এখানে ফেলে রাখা চলে না।

(সমর ও বিমলেন্দু চেয়ার হইতে হরিশকে ধরিয়া তুলিল)

হরিশ (চক্ষু মুদ্রিত অবস্থায় বিমলেন্দু ও সমরের স্কন্ধে ভর দিয়া অগ্রসর হইতে হইতে) বড় মধুর স্বপ্ন! কি বলছ মা? যাব তোমার সঙ্গে? চল—যাব, নিশ্চয় যাব! কিন্তু ঘুম ভেঙ্গে যাবে না তো? (বলিতে বলিতে বিমলেন্দু ও সমরের স্কন্ধে ভর দিয়া দক্ষিণ দিকের দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেল।)

মিসেস রায়। কই, আয় রে সুমিত্রা—আচ্ছা চলি তাহলে রঞ্জন—
(মিসেস রায় বাহির হইয়া গেলেন। রঞ্জনকে অভিভূতের ন্যায় দণ্ডায়মান দেখা গেল।)

সুমিত্রা। (বাহির হইয়া যাইবার সময় হঠাৎ রঞ্জনের নিকট আসিয়া, মৃদু স্বরে) এসব ঘটনার পর, আশা করি আপনি আর আমাদের বাড়ী যাবেন না! যদিও যান, তো জেনে রাখুন, আপনাকে দেখলে আমার বিরক্তি বাড়বে বই কমবে না। (বাহির হইতে মিসেস রায় ডাকিলেন—'কইরে সুমি, আয়!' সুমিত্রা—'যাই মা'—এই বলিয়া, রঞ্জনকে কথা বলিবার অবকাশ না দিয়া বাহির হইয়া গেল।)

রঞ্জন। (কয়েক মুহূর্ত পরে, অস্ফুট স্বরে) নির্বোধ রাজকুমার—চিত্রার কাছে সমরের হ্যাণ্ডনোট—তবে কি সুমিত্রা? না না, এ অসম্ভব, এ হতে পারে না—আমি পাগল, তাই এসব কথা মনে হচ্ছে—
(রঞ্জনকে দেখিয়া মনে হইতেছিল, কি যেন একটা কথা গভীর ভাবে চিন্তা করিতেছে। অল্পক্ষণ এইভাবে কাটিয়া গেলে, ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া রায়কে প্রবেশ করিতে দেখা গেল।)

রঞ্জন। একি আপনি?

রায়। হ্যাঁ রঞ্জন, যেতে পারলাম না। একটা প্রশ্ন আমার মনকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে—তাই তোমার কাছে ছুটে এলাম।

রঞ্জন। বলুন, কি জানতে চান—

রায়। (উদ্বিগ্ন ভাবে) একটু আগে চিত্রা কি যেন সব বলে গেল—

রঞ্জন। বলে গেল, সমরবাবু হ্যাণ্ডনোট লিখে তার কাছ থেকে টাকা ধার করেছেন—

রায়। কিন্তু সমর টাকা ধার করতে যাবে কেন?, তার নিজের তো টাকার অভাব নেই! আর তাছাড়া টাকার দরকার হলে, সে

আমার কাছ থেকে নিতে পারত! শোন রঞ্জন—তোমায় একটা কথা জিজ্ঞেস করব—কিছু মনে করবে না তো?

রঞ্জন। না না, মনে করব কেন? কি জানতে চান, বলুন—

রায়। তুমি বোধ হয় জান না রঞ্জন, সমরের সঙ্গে সুমিত্রার বিয়ের সব ঠিক হয়ে গেছে। আমাদের পরিচিত মহলে সকলেই এ কথাটা জানে—

রঞ্জন। সুমিত্রার মত আছে এ বিয়েতে?

রায়। হ্যাঁ, সুমিত্রা বলে দিয়েছে, আমাদের মতেই তার মত। তবে যে রকম খামখেয়ালী মেয়ে, মত বদলাতে কতক্ষণ? তাইতো তোমার কাছে ছুটে এলাম। হ্যাঁ রঞ্জন, এ ব্যাপারের সঙ্গে তোমার কোন সম্পর্ক নেই তো?

রঞ্জন। তার মানে?

রায়। একটু আগে চিত্রা যে কথা বলে গেল, তা যে সম্পূর্ণ মিথ্যে, সেটা তুমিও জান, আমিও জানি।

রঞ্জন। আপনি হয়ত জানতে পারেন, কিন্তু আমি তো জানি না।

রায়। (অসহিষ্ণু স্বরে) তুমি না জানতে পার, কিন্তু আমি জানি, ও কথার মধ্যে এতটুকু সত্যি নেই। চিত্রার উদ্দেশ্য ছিল, সমরকে সুমিত্রার চোখে ছোট করা। কিন্তু কেন? তাইতো তোমাকে জিজ্ঞেস করছি, তোমার এ ব্যাপারের সঙ্গে কোন সম্পর্ক আছে কিনা?

রঞ্জন। আজ্ঞে না, চিত্রাকে আমি কিছু শিখিয়ে দিই নি।

রায়। (অপ্রস্তুত হইয়া) না—মানে—আমি বলছিলাম—

রঞ্জন। না, না, আপনার কুণ্ঠিত হবার কিছু নেই। আমি যদি নিজেকে সুমিত্রা দেবীর যোগ্য বলে মনে করতাম, তাহলে হয়ত তাঁকে পাবার শেষ উপায় হিসেবে এই পথই অবলম্বন করতাম। কিন্তু আমি

জানি, সুমিত্রা দেবী আমাকে ভালবাসেন না, আর আমিও নিজেকে তাঁর যোগ্য বলে মনে করি না।

রায়। যাক্—তুমি আমাকে নিশ্চিন্ত করলে রঞ্জন। আচ্ছা, তাহলে আমি এখন চলি—(বাহির হইয়া যাইতে যাইতে) তুমি কিন্তু সময় করে একদিন আমাদের ওখানে এস—

রঞ্জন। নিশ্চয় যাব—(রায় বাহির হইয়া গেলেন)

(রায় বাহির হইয়া যাইবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পিছন দিকের দরজা দিয়া কৃপানাথের প্রবেশ)

রঞ্জন। এস কৃপানাথ, তোমাকে আমার বড় দরকার—

কৃপানাথ। আপনাকেও আমার খুব দরকার। শুধু রায় ছিলেন বলেই ঘরে ঢুকতে পারি নি।

রঞ্জন। তাহলে বল, তোমার দরকারটাই আগে শুনি—

কৃপানাথ। বাড়ীতে শুয়েছিলাম। হঠাৎ মনে হল, আমি নীতি-জ্ঞানহীন বর্বর। তাই আপনার কাছে স্বীকারোক্তি করতে এলাম।

রঞ্জন। কি ব্যাপার বল তো কৃপানাথ? টাকা ধার করতে আস নি তো?

কৃপানাথ। এবার আপনি আমায় একেবারে নক্-আউট করে দিয়েছেন স্যার! এখানে আসছিলাম, স্বীকারোক্তি করবার উদ্দেশ্য নিয়ে। আসতে আসতে মনে হল, আচ্ছা, যদি ঠিক তার পরেই আপনার কাছে পঁচিশটা টাকা ধার চাই—তাহলে কেমন হয়? আমি যে নীতি-জ্ঞানহীন বর্বর, তার একটা প্রমাণও দেওয়া হবে!—(পকেট হইতে একটি চিঠি বাহির করিয়া) যতীন আপনাকে একটা চিঠি পাঠিয়েছে—

রঞ্জন। (চিঠি পড়িবার পর মুহূর্তের জন্য কি যেন চিন্তা করিল। তাহার পর চিঠিটি পকেটে রাখিয়া, পার্স হইতে পঁচিশ টাকা বাহির

করিয়া কৃপানাথের হাতে দিয়া) টাকা আমি তোমায় দিচ্ছি কৃপানাথ, কিন্তু আমার একটা প্রশ্নের সত্যি উত্তর দেবে তো ?

কৃপানাথ। (টাকা পকেটে পুরিয়া) আপনার কাছে গীতা আছে স্যার ? বাইবেল ? কোরাণ ? (রঞ্জন মাথা নাড়িলে) নেই ? থাক, দরকার নেই—(নিকটে আসিয়া রঞ্জনকে স্পর্শ করিয়া) আপনিই আমার গীতা বাইবেল কোরাণ! এই আপনাকে ছুঁয়ে বলছি, যাহা বলিব সত্য বলিব, সত্য ছাড়া মিথ্যা বলিব না।

রঞ্জন। (মৃদু হাসিয়া) একটু আগে ওঁরা যখন এখানে ছিলেন, তখন চিত্রা এসেছিল। তার আসার সঙ্গে তোমার কোন সম্পর্ক আছে কি কৃপানাথ ? (কৃপানাথকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া) তাহলে দেখছি আমার সন্দেহ ঠিক—তুমিও এ ব্যাপারের মধ্যে আছে।

কৃপানাথ। (মাথা নীচু করিয়া) আজ্ঞে অমি শুধু চিত্রার কাছে খবর দিয়ে এসেছিলাম—এই সময় এই এই লোক এখানে থাকবে।

রঞ্জন। কে তোমাকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছিল কৃপানাথ ?

কৃপানাথ। আজ্ঞে ?

রঞ্জন। (অসহিষ্ণু স্বরে) ভণিতা রেখে আমার কথার জবাব দাও কৃপানাথ! কে তোমাকে পাঠিয়েছিল ?

কৃপানাথ। (ভীতস্বরে) আজ্ঞে সুমিত্রা দেবী—

রঞ্জন। (উত্তেজিত অবস্থায়) অসম্ভব, এ হতে পারে না! (কৃপানাথ কি যেন বলিতে যাইতেছিল) না না, চুপ কর কৃপানাথ! তোমায় কোন কথা বলতে হবে না—তোমাকে আমি বিশ্বাস করি না!—তুমি আমার সামনে থেকে যাও কৃপানাথ—যাও—এখনি—(অস্বাভাবিক উত্তেজনায় রঞ্জনের সর্বাঙ্গ কম্পিত হইতেছিল)

কৃপানাথ। (ভীত স্বরে) কিন্তু স্যার আপনার সর্বাঙ্গ কাঁপছে—

রঞ্জন। কাঁপুক! তুমি আমার সামনে থেকে না গেলে, আমার এ কাঁপুনি থামবে না। তুমি যাও কৃপানাথ, এখনি—

কৃপানাথ। (ভীত স্বরে) আমি যাচ্ছি—কিন্তু—(রঞ্জনের উত্তেজনা বৃদ্ধি পাইতে দেখিয়া) না না, আপনি ব্যস্ত হবেন না, আমি এখনি যাচ্ছি—(দক্ষিণ দিকের দরজা দিয়া দ্রুত প্রস্থান)

(কৃপানাথ চলিয়া গেলে রঞ্জন দুই হাতে রগ চাপিয়া ধরিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে নিকটবর্তী চেয়ারে বসিয়া পড়িল। কয়েক মুহূর্ত্ত এইভাবে কাটিবার পর মিসেস রায় প্রবেশ করিলেন। ততক্ষণে রঞ্জন নিজেকে আয়ত্তে আনিয়া ফেলিয়াছে, মিসেস রায়কে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।)

রঞ্জন। (ব্যস্ত হইয়া) একি আপনি! কিন্তু হরিশ—?

মিসেস রায়। (গম্ভীর ভাবে) হরিশের ব্যবস্থা বিমলেন্দু আর সমর করছে, আমি ওদের বাড়ী পৌঁছে দিয়ে ফিরে এলাম। (অল্প ইতস্তত: করিয়া) আজ আমি তোমার কাছে এসেছি একটা প্রশ্ন নিয়ে রঞ্জন। সুমিত্রা আর বিমলেন্দুকে নিয়ে এসেছিলাম ওদের সামনেই জিজ্ঞেস করব বলে। কিন্তু গোলমালে বলা হ'ল না, তাই আবার ছুটে এলাম তোমার কাছে—প্রশ্নটা খুবই গুরুতর রঞ্জন!

রঞ্জন। বলুন?

মিসেস রায়। মাস কয়েক আগে তুমি সুমিত্রাকে একখানা চিঠি লিখেছিলে রঞ্জন?

রঞ্জন। (কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিবার পর) হাঁ— লিখেছিলাম—

মিসেস রায়। (ব্যস্ত হইয়া) কেন লিখেছিলে? কি লিখেছিলে? কই, সে চিঠি দেখি?

রঞ্জন। (বিস্ময়ান্বিত হইয়া) সে চিঠি তো আমার কাছে নেই!

চিঠি আছে সুমিত্রা দেবীর কাছে, অবশ্য যদি না সুমিত্রা দেবী সে চিঠি নষ্ট করে ফেলে থাকেন।

মিসেস রায়। কি লিখেছিলে সে চিঠিতে? না না, তুমি অত ভয় পাচ্ছ কেন? এতে ভয় পাবার কিছু নেই—

রঞ্জন। ভয় আমি পাই নি মিসেস রায়। তাঁকে চিঠি লেখা উচিত নয়, একথা একবারও আমার মনে হয় নি।

মিসেস রায়। (অসহিষ্ণুভাবে) চুপ কর। বাজে কথা বলবে পরে—আগে বল চিঠিতে কি লিখেছিলে?

রঞ্জন। আমার চিঠি লেখাটা দেখছি আপনি পছন্দ করেন নি। অবশ্য আপনার প্রশ্নের জবাব আমি নাও দিতে পারি। কিন্তু তা করব না, জবাব আমি দেব—তার কারণ, সুমিত্রা দেবীকে চিঠি লিখে আমি কোন অন্যায় করি নি। চিঠিতে আমি লিখেছিলাম—"আমি যে কেন তোমায় চিঠি লিখছি তা আমি নিজেই জানি না বন্ধু! আমি যে আছি এই কথাটা তোমায় জানাতে ইচ্ছে করছে—এ ছাড়া আমার লেখবার বা বলবার মত কিছু নেই। আমার মনের একান্ত কামনা —তুমি যেন সুখী হও; সত্যিই কি তুমি সুখী সুমিত্রা?"

মিসেস রায়। কিন্তু এ তো অর্থহীন! এ চিঠির অর্থ কি?

রঞ্জন। সাধারণ ভাবে ও চিঠির অর্থ আমি বলতে পারব না। ঠিক ঐ মুহূর্তে মনে হয়েছিল জীবন বড় সুন্দর! বড় আশা, বড় আনন্দ হয়েছিল মনে—চিঠিটা সেই অনুভূতিরই একটা প্রকাশ মাত্র।

মিসেস রায়। কিসের আনন্দ? কিসের আশা?

রঞ্জন। আশা ভবিষ্যতের। আর আনন্দ? তা তো ঠিক বলতে পারব না। তবে সেদিন বড় দুঃখের মাঝে সুমিত্রা দেবীর কথা মনে হয়েছিল। মনে হওয়া মাত্রই সমস্ত অন্ধকার কেটে গেল। নিজেকে বড় হালকা বলে মনে হল। মনে হল আমি বেঁচে আছি—সুস্থ সবল

মন নিয়ে বেঁচে আছি—আমি আর নির্বোধ, জড় নই! মানুষ আমার দিকে দয়া আর তাচ্ছিল্যের দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকবে না। তারা সকলে—আপনি, চিত্রা, মিস্টার রায়, আনন্দ, অনিলেন্দু বিমল, কৃপানাথ, সুমিত্রা দেবী—এরা সকলে আমাকে তাদেরই একজন বলে মনে করবে! উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে মন ভরে উঠল আশায়, আনন্দে—মনে হল এ আনন্দের ভাগীদার চাই! কি জানি কেন মনে এল সুমিত্রা দেবীর কথা, মনে হল তিনি আমার আপনজন—তাই তাঁকে চিঠি লিখলাম।

মিসেস রায়। তুমি সুমিত্রাকে ভালবাস, রঞ্জন?

রঞ্জন। আপনি যে অর্থে জিজ্ঞেস করছেন, সে অর্থে নয়।

মিসেস রায়। তবে তোমার চিঠি লেখার উদ্দেশ্য কি?

রঞ্জন। দেখুন, প্রশ্নটা আমার কাছে বড় অপ্রিয় বলে মনে হচ্ছে!

মিসেস রায়। (অসহিষ্ণু স্বরে) অপ্রিয় বলে মনে হ'ক—কোন ক্ষতি নেই তাতে! শোন রঞ্জন, তুমি সত্যি বলছ তো?

রঞ্জন। আমার দিক থেকে আপনার কোন আশঙ্কা নেই—আমি নিজেকে সুমিত্রা দেবীর যোগ্য বলে মনে করি না।

মিসেস রায়। চিঠি তুমি কি বিমলেন্দুর হাত দিয়ে পাঠিয়েছিলে?

রঞ্জন। চিঠিটা বিমলেন্দু সুমিত্রা দেবীর হাতে পৌঁছে দিয়ে এসেছিল।

মিসেস রায়। (ব্যস্ত হইয়া) আচ্ছা রঞ্জন, সুমিত্রা যে নির্বোধ রাজকুমারের গল্পটা বললে—কেন বললে বলতে পার?

রঞ্জন। (মৃদু হাসিয়া) ঠিক বলতে পারি না—তবে বোধ হয় কাউকে ঠাট্টা করবার জন্যে।

মিসেস রায়। (অসহিষ্ণু স্বরে) তোমাকে নিশ্চয়! বাঃ চমৎকার! আমি শুধু ভেবে পাচ্ছি না, তোমার মধ্যে সে কি এমন পেলে?

আশ্চর্য! বাড়িতে তোমার কথা উঠলেই তো বলে, তুমি একটা ইডিয়ট, জড়!

রঞ্জন। (তিরস্কারের স্বরে) এ কথাটা আমাকে আপনার না বললেও চলত!

মিসেস রায়। রাগ করো না বাবা রঞ্জন। দোষ আমাদেরই—আমরা আদর দিয়ে তাকে নষ্ট করে ফেলেছি।

রঞ্জন। না না, রাগ করি নি। আমি শুধু বলছিলাম—

মিসেস রায়। (বাধা দিয়া) না না, রাগ করার এতে কিছু নেই। আমি তার স্বভাব জানি। সে যাকে স্নেহ করে—(রঞ্জনকে মৃদু হাসিতে দেখিয়া)—না না, তোমার এতে উৎসাহিত হবার কিছু নেই। ও কল্পনাও তুমি মনে স্থান দিয়ো না রঞ্জন! সুমিত্রার সঙ্গে তোমার বিয়ে কোনদিনই হবে না—অন্ততঃ আমি বেঁচে থাকতে নয়! তুমি এখন থেকে সাবধান হও রঞ্জন, নইলে পরে কষ্ট পাবে—(রঞ্জনকে মৃদু হাসিতে দেখিয়া, তাঁহার মনে কেমন যেন সন্দেহ হইল।) আচ্ছা রঞ্জন, আমার একটা কথার সত্যি জবাব দেবে—ঐ মেয়েটাকে তুমি বিয়ে কর নি?

রঞ্জন। (ভীষণ ভাবে চমকিত হইয়া) এ কি বলছেন আপনি!

মিসেস রায়। কিন্তু একবার যে শুনেছিলাম, তোমাদের বিয়ে হবে—প্রায় সব ঠিক হয়ে গেছে?

রঞ্জন। কিন্তু একটা ভুল করছেন আপনি। প্রায় সব ঠিক হয়ে গেছে মানে বিয়ে হওয়া নয়।

মিসেস রায়। কিন্তু তুমি তো তার জন্যেই এখানে এসেছ?

রঞ্জন। এ বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন—তাকে বিয়ে করতে এখানে আসি নি।

মিসেস রায়। কিন্তু—

রঞ্জন। আমি মিথ্যে বলি না মিসেস রায়।

মিসেস রায়। যাক্ এবার আমি একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচব। হ্যাঁ, তবে একটা কথা জেনে রেখ—সুমিত্রা তোমাকে ভালবাসে না, সুমিত্রার সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে না—অন্তত আমি বেঁচে থাকতে নয়!

রঞ্জন। (বিষাদ গম্ভীর স্বরে) ও কথাটা আমায় অতবার করে বলবার দরকার হবে না, মিসেস রায়।

মিসেস রায়। (ব্যস্ত হইয়া) না না, তুমি আমায় ভুল বুঝো না। তুমি যদি জানতে কত দুশ্চিন্তা আমার মনে, কত দুঃখ, কত ব্যথা! জান রঞ্জন তোমাকে আমার বড় আপনার বলে মনে হয়! এর আগে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে মোটে একবার। কিন্তু তারপর থেকে, কি জানি কেন, আমার বার বার মনে হয়েছে—তুমিই আমার আপন জন, তোমাকেই বলতে পারি আমার মনের কথা! জান রঞ্জন, রোজ রাতে আমার বড় কান্না পায়, অন্ধকারের মধ্যে আমি নিঃশব্দে কাঁদি। ভাবি দিনের বেলায় লোককে বুঝিয়ে বলব আমার দুঃখের কথা। কিন্তু গুছিয়ে বলতে পারি না সব কথা, কি বলতে কি বলে ফেলি! বড় রাগ হয় তখন লোকের ওপর, নিজের ওপর, সকলের ওপর।

রঞ্জন। আপনার দুঃখ আমি বুঝি, মিসেস রায়। এই সুখ, শান্তি এরই মাঝে রয়েছে মানুষ। তবু কেন তারা সুখী নয়? কেন এত অশান্তি, কেন এত দুঃখ?

মিসেস রায়। কিন্তু এর কি কোন উত্তর নেই রঞ্জন?

রঞ্জন। আছে বই কি। আজকের মানুষ তার নিজের দুঃখ বোঝে, বোঝে সে যে শ্রেণীর লোক সেই শ্রেণীর লোকের দুঃখ। যে দিন সে সকলের দুঃখ বুঝবে, সেদিন এর উত্তরও সে পাবে।

মিসেস রায়। কিন্তু সে তো কোনদিনই হবে না রঞ্জন। এই দেখ না, তোমার দুঃখ, আমার নিজের ব্যথা, আরো অনেকের দুঃখ আমি বুঝি। কিন্তু ঐ মেয়েটা, চিত্রা—ওকে তো কখনো আমার আপনার বলে মনে হয় না—

রঞ্জন। (মৃদু হাসিয়া) হবে মিসেস রায়। নিজের ঘরের গণ্ডীটাকে বাড়িয়ে নিন, দেখবেন, চিত্রাকেও আপনার নিজের বলে মনে হবে।

মিসেস রায়। কি জানি হয়ত তোমার কথাই ঠিক—(অল্পক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া) আচ্ছা রঞ্জন, একটু আগে চিত্রা যে কথা বলে গেল, তা কি সত্যি ?

রঞ্জন। আমি ও সম্বন্ধে কিছুই জানি না। কিন্তু আশ্চর্য—একটু আগে মিষ্টার রায়ও ঠিক ঐ কথাই জিজ্ঞেস করতে এসেছিলেন।

মিসেস রায়। ও এসেছিল নাকি ? আমি তখনি জানি, এর মধ্যে গোলমাল রয়েছে। জানো রঞ্জন, ও সমরের সঙ্গে সুমিত্রার বিয়ে ঠিক করেছে। প্রথমে আমিও মত দিয়েছিলাম। আর দেবই না বা কেন ? ওঁর বন্ধুর ছেলে, আমাদের পাল্টা ঘর, বাপের এক ছেলে! কিন্তু আর তো এগুনো যাবে না। অবিশ্যি সুমিত্রাও সমরকে বিয়ে করতে রাজী হবে বলে মনে হয় না। তাই বা বলি কি করে! জানলে রঞ্জন, ভাবনা কি আমার একটা! এই সুমিত্রা কোন্‌দিন কি করে বসে তার কি কিছু ঠিক আছে ? কোন্‌দিন হয়ত আমার ওপর কি তোমার ওপর রাগ করে বলে বসবে—সমরকে ছাড়া কাউকে বিয়েই করব না!

রঞ্জন। (মৃদু হাসিয়া) আপনি ভুল করছেন। আমার ওপর রাগ করে কোন কিছু করে বসার মত সম্পর্ক আমার সঙ্গে তাঁর নেই।

মিসেস রায়। তুমি জান না রঞ্জন—ও সব করতে পারে। কি রকম খামখেয়ালী মেয়ে, তাই আমার এত ভয়! ও চিত্রাকে চিঠি-পত্র লেখে, জান সে কথা?

রঞ্জন। (ব্যাকুল স্বরে) আপনি ঠিক জানেন?

মিসেস রায়। ঠিক জানি মানে! আমার কাছে প্রমাণ পর্যন্ত আছে—(হঠাৎ যেন অকূলে কুল পাইয়াছেন, এই ভাবে) রঞ্জন, তুমি আমার সঙ্গে আমাদের বাড়ি যাবে এখন—ওকে একটু বুঝিয়ে বলবে—

রঞ্জন। কিন্তু—

মিসেস রায়। (ক্রুদ্ধ স্বরে) কিন্তু কি শুনি? তোমায় এখন অন্য জায়গায় যেতে হবে—কোথায় শুনি? (রঞ্জন কি যেন বলিতে যাইতেছিল)—আমি জানি—যতীনের কাছে ক্ষমা চাইতে! দেখ রঞ্জন, হরিশকে আমি ক্ষমা করেছি। আমি জানি সে কিছুই জানত না। কিন্তু যতীন নির্দোষ নয়! ও সব জেনে শুনেই তোমায় ঠকাতে এসেছিল!

রঞ্জন। যতীন সম্বন্ধে আপনি ভুল ধারণা করেছেন। একটু আগে যতীন কৃপানাথের হাত দিয়ে একটা চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছে।—কি লিখেছে শুনবেন—(পকেট হইতে বাহির করিল)

মিসেস রায়। কই দেখি, কি লিখেছে? (রঞ্জনের হাত হইতে চিঠি লইয়া অল্প জোরে পড়িতে লাগিলেন)—"মহাশয়, অপরে আমাকে অর্থলোভী, ইতর বলিয়া মনে করিতে পারে, কিন্তু আপনি সেরূপ মনে করেন না। সেই ভরসায় আমি আপনাকে পত্র লিখিতেছি। মার নিকট জানিতে পারিলাম, আপনার কথাই ঠিক, সম্পত্তির উপর আমার ন্যায়সঙ্গত দাবি নাই। আমার এই ভুলের জন্য আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আজিকার স্বার্থবুদ্ধি সম্পন্ন পৃথিবীতে মহৎ

ও নির্বোধের মধ্যে পার্থক্য ধরা খুবই কঠিন। আমিও ধরিতে পারি নাই, আপনাকে নির্বোধ বলিয়া ভুল করিয়াছিলাম। আপনি আমার মাকে যে অর্থ সাহায্য করিয়াছেন, তজ্জন্য আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ! কিন্তু ঋণ শোধ করিবার মত অবস্থা আমার নাই। এই অবস্থায়, আপনার সম্মুখে নিজেকে বড় দুর্বল অসহায় বলিয়া মনে হইবে। এই কারণে এই পত্রের সঙ্গে সঙ্গে আপনার সহিত সম্পর্ক শেষ করিতে চাই। আশা করি আপনি ভুল বুঝিবেন না। পূর্বের একশত টাকা যথা সময় শোধ করিয়া দিব—হরিশকে দেখিবেন—ইতি যতীন”—(পত্র পড়া শেষ হইলে দেখিলেন রঞ্জনের মুখে মৃদু হাসি। ক্রুদ্ধ স্বরে) হাসছ কেন শুনি?

রঞ্জন। (মৃদু হাসিতে হাসিতে) চিঠিটা পড়ে আপমার আনন্দ হয়েছে, এ কথা আপনি অস্বীকার করতে পারেন না!

মিসেস রায়। ওঃ কি নির্বোধ! বুঝতে পার নি—এই চিঠির প্রত্যেক ছত্রে রয়েছে তার নিজের সম্বন্ধে অহংকার।

রঞ্জন। তা আমি জানি। কিন্তু এত অহংকার সত্ত্বেও সে তার ভুল স্বীকার করেছে, আমার কাছে মাফ চেয়েছে। যতীন সম্বন্ধে আপনার ধারণা পাল্‌টে যাবার পক্ষে এটাই যথেষ্ট নয় কি?

মিসেস রায়। তুমি বড় বেশী বাজে কথা বল রঞ্জন!

রঞ্জন। কিন্তু এ কথাটা আমি মোটেই বাজে বলি নি। যতীনের সম্বন্ধে আপনার ধারণা বদলেছে। যতীনকে নিজের গণ্ডীর ভেতরের একজন বলে মনে করতে পেরে আপনার আনন্দ হচ্ছে। আমি শুধু বুঝতে পারছি না, এ কথাটা স্বীকার করতে আপনার এত লজ্জা কেন!

মিসেস রায়। (হঠাৎ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া) সে কৈফিয়ত আমি তোমার কাছে দেব না! কি ভাবে কার সঙ্গে কথা বলতে হয়, তা পর্যন্ত জান না? অসভ্য অভদ্র কোথাকার—(দক্ষিণ দিকের দরজার দিকে অগ্রসর হইলেন)

রঞ্জন। (মৃদু হাসিতে হাসিতে) মিথ্যে আমার ওপর রাগ করছেন। কালই আবার আসবেন আমাকে নেমন্তন্ন করতে।

মিসেস রায়। (ফিরিয়া) কখনও না, কোন দিন না। তোমাকে আমার বারণ করা রইল রঞ্জন, আমাদের বাড়ীতে কোন দিন আসবে না তুমি।

রঞ্জন। বারণ না করলেও চলত মিসেস রায়। আপনার আগে আর একজন বারণ করে গেছেন।

মিসেস রায়। (নিকটে আসিয়া) বারণ করে গেছে? কে?

রঞ্জন। সুমিত্রা দেবী।

মিসেস রায়। সুমিত্রা? কখন বারণ করলে সে?

রঞ্জন। যখন আপনারা হরিশকে নিয়ে নীচে নামছিলেন।

মিসেস রায়। কি বলেছে সে—?

রঞ্জন। আমি যেন আপনাদের বাড়ি কোন দিন না যাই। আমি গেলে তাঁর বিরক্তি বাড়বে বই কমবে না।

মিসেস রায়। (আকুল আগ্রহের সহিত) রঞ্জন, তুমি এখনি আমার সঙ্গে এস—(রঞ্জনের হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইতে যাইতে)—না বললে আমি শুনব না রঞ্জন, তোমায় যেতেই হবে! কেন বলবে সে এ কথা? কোন অধিকারে সে তোমার সঙ্গে এরকম অভদ্র ব্যবহার করবে?

রঞ্জন। কিন্তু আমার এখন মনে হচ্ছে, হয়ত ও কথা বলে, তিনি আমায় যাবার নিমন্ত্রণই করে গেছেন।

মিসেস রায়। তাই তো করে গেছে! তুমি নির্বোধ বলেই কথাটা বুঝতে তোমার এত দেরী হয়েছে। কিন্তু এভাবেই বা বললে কেন? ভেবেছে, তোমার মত নির্বোধকে এমনি বললে হয়ত আসবে না! কিন্তু কেন? কি পেয়েছে সে তোমার মধ্যে? (রঞ্জনের

মুখের দিকে তাকাইয়া) তবে হয়ত তোমাকে সে—না না, রঞ্জন—আমি স্বপ্ন দেখছিলাম। সত্যি নয়, এ হতে পারে না! তোমাকে ডেকেছে, তোমাকে নিয়ে খানিকটা মজা করবে বলে! এস রঞ্জন, যেতে তোমাকে হবেই—আজই—এখনি! (রঞ্জনকে একরূপ টানিয়াই লইয়া যাইতেছিলেন বলা যাইতে পারে। দরজার নিকট গিয়া হঠাৎ থামিলেন। রঞ্জনের মুখের উপর তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ। বলিয়া উঠিলেন) মনে কোন আশা রেখ না রঞ্জন—সব মিথ্যে—সব মিথ্যে—(এই বলিতে বলিতে রঞ্জনকে লইয়া দক্ষিণ দিকের দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেলেন।)

[পর্দাও এই সঙ্গে সঙ্গে নামিয়া আসিল]

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ঐ দিন, বেলা এগারটা। রায়ের বাড়ির পশ্চাদ্‌ভাগসংলগ্ন উদ্যান। উদ্যানের মধ্যে এ্যাসবেষ্টস সেড দ্বারা আচ্ছাদিত ক্ষুদ্র ছায়ামণ্ডপ। বাড়ির পশ্চাদ্‌ভাগ পড়িয়াছে বাম পার্শ্বে। দক্ষিণ পার্শ্বে এক কোণে উদ্যান হইতে বাহির হইবার মাঝারি উচ্চতার একটি ফটক। ফটকের পাশ দিয়া রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। সেডের নীচে হালকা সবুজ রঙের কয়েকখানি বেতের চেয়ার ও টেবিল। টেবিলের উপর ফুলদানিতে টাটকা ফুল। একটি চেয়ারে রায় বসিয়া আছেন। শঙ্করকে দিয়া মিসেস রায়কে ডাকিতে পাঠাইয়াছেন। বাম দিক হইতে মিসেস রায় প্রবেশ করিলেন।)

রায়। এই যে অপর্ণা, আমি যে তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছি।—একটা কথা—

মিসেস রায়। (বাধা দিয়া, উদ্বেগাকুল কণ্ঠস্বরে) তোমার কথা পরে হবে! তুমি ডক্টর সেনের সঙ্গে নেমে গেলে—কি বললেন উনি হরিশকে দেখে? দোহাই তোমার—কিছু লুকিও না আমার কাছ থেকে!

রায়। (ছদ্ম আন্তরিকতার সহিত) না না, লুকোব কেন? আমি কি জানি না, তুমি কত ব্যস্ত হয়ে রয়েছ? সেন বললেন, condition একেবারে hopeless নয়—ঠিক মত চিকিৎসা আর সেবা পেলে বেঁচে যেতে পারে—

মিসেস রায়। (উৎফুল্ল হইয়া) যাক্ আশা আছে তাহলে! মা সারদেশ্বরী বাছাকে আমার ভাল করে দিন (উদ্দেশে প্রণাম করিলেন)। সেবার কোন ত্রুটী হবে না—আমি নিজে দাঁড়িয়ে

থেকে সব করব! (চিন্তিত হইয়া) কিন্তু একা আমি, আর অতবড় রোগ—

রায়। তোমায় কিছু ভাবতে হবে না—সব ব্যবস্থা আমি করেছি। সেন এখনি দুজন trained nurse পাঠিয়ে দেবেন। তাছাড়া তিনি নিজেও রোজ আসবেন। যাবার সময় বলে গেলেন—"যা করবার আমিই করব, আপনাদের ভাববার কোন প্রয়োজন নেই।"

মিসেস রায়। আঃ বাঁচলুম! কি ভয়ই যে হয়েছিল আমার!

রায়। এবার খুশী নিশ্চয়! হ্যাঁ, ভাল কথা—সমর কোথায়?

মিসেস রায়। সমর, রঞ্জন, সুমিত্রা, ওরা ভেতরে ড্রয়িংরুমে বসে গল্প করছে—

রায়। রঞ্জন কখন এল?

মিসেস রায়। আমার সঙ্গেই তো এল। তুমি বোধ হয় লক্ষ্য কর নি। কিছুতে আসবে না—জোর করে ধরে নিয়ে এলাম! বলে—সুমিত্রা নাকি তাকে আসতে বারণ করেছে!

রায়। (সচকিত হইয়া) বারণ করেছে! সুমিত্রা? কখন?

মিসেস রায়। আমরা যখন হরিশকে নিয়ে নীচে নামছিলাম, তখন একা পেয়ে রঞ্জনকে না কি বলেছে, সে আমাদের বাড়ি এলে তার বিরক্তি বাড়বে বই কমবে না!

রায়। (অস্ফুট স্বরে) বিরক্ত হবে! সুমিত্রা?—কিন্তু সেই গল্পটা—

মিসেস রায়। কি বলছ? কিসের গল্প?

রায়। না—কিছু না—মানে—

মিসেস রায়। থাক্, কিছু বলতে হবে না! চিরটা কাল আমার কাছে কথা লুকিয়েই গেলে।

রায়। না না, আমি জিজ্ঞেস করছিলাম—মানে—সুমিত্রা রঞ্জনকে কিছু অপমান-টপমান করে বসে নি তো?

মিসেস রায়। মোটেই নয়! সে তো তোমারই মেয়ে, ঠিক তোমারই মত হেঁয়ালী! এখন দেখগে যাও, কেমন হেসে কথা কইছে! যাক্‌গে ওসব কথা—এখন ডাকছিলে কেন বল তো?

রায়। (সংশয়-জড়িত কণ্ঠস্বরে) আমি আজ সকালে সমরের বাবা যোগেনের সঙ্গে কথাবার্তা ঠিক করে এসেছি অপর্ণা—সামনের রবিবার সকালে ওরা সুমিত্রাকে আশীর্বাদ করতে আসবে!

মিসেস রায়। কিন্তু ওখানে তো সুমিত্রার বিয়ে হবে না—

রায়। বিয়ে হবে না! কেন?

মিসেস রায়। (ক্রুদ্ধ স্বরে) তোমার কি চোখ নেই? সকালে ঐ মেয়েটা এল, দেখতে পেলে না?

রায়। কিন্তু ওসব কথা মিথ্যে! আমি জানি, ওর এক বর্ণও সত্যি নয়!

মিসেস রায়। সব মিথ্যে। তাও কি কখনও হয়!

রায়। (উত্তেজিত হইয়া) সব মিথ্যে! আমি তোমায় প্রমাণ করে দেব। আমায় দুটো দিন সময় দাও—যদি প্রমাণ না করে দিতে পারি, আমি কথা দিচ্ছি, বিয়ে আমি ভেঙ্গে দেব।

মিসেস রায়। কিন্তু সমর ছাড়া কি পাত্র নেই দেশে? তোমার তো টাকার অভাব নেই।

রায়। পাত্র অনেক আছে। কিন্তু সমরের মত পাত্র তুমি পাবে কটা? শিক্ষিত—সচ্চরিত্র—(মিসেস রায় কি যেন বলিতে যাইতেছিলেন)—না না, আমি তোমাকে প্রমাণ করে দেব, ও কথা মিথ্যে! আর ঘর হিসেবে তো কোন আপত্তির কথাই ওঠে না।

মিসেস রায়। না না, ঘর হিসেবে তো কোন কথাই ওঠে না। যোগেন চৌধুরীর নাম লোকে তোমার আগেই করে থাকে।

রায়। তার ওপর বাপের একমাত্র সন্তান—আর সুমিত্রাও আমার একটি—এরপর—

মিসেস রায়। (বাধা দিয়া) কিন্তু মেয়েটাই বা শুধু শুধু সমরের নামে বাজে কথা বলবে কেন।

রায়। তা আমি ঠিক বলতে পারি না। তবে মনে হয়, চিত্রা বোধ হয় চায় না সুমিত্রার সঙ্গে সমরের বিয়ে হক। সে বোধ হয় চায়, সুমিত্রার সঙ্গে রঞ্জনের—

মিসেস রায়। সুমিত্রার সঙ্গে রঞ্জনের! (এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া) কিন্তু আমারও তাই মনে হয়—

রায়। তুমি কি পাগল হয়ে গেলে অপর্ণা?

মিসেস রায়। কেন? রঞ্জন সত্যিই কিছু নির্বোধ নয়! আর টাকা পয়সা—

রায়। (বাধা দিয়া) আমি জানি, রঞ্জন সত্যিই কিছু নির্বোধ নয়। জানি, কীর্তিনাথ রায়ের অর্ধেক সম্পত্তি এখন তারই। তবুও নয়—এ অসম্ভব!

মিসেস রায়। কেন, অসম্ভব কেন? তোমার স্বার্থে বাধছে বলে?

রায়। (অস্বস্তির সহিত) হুঁ স্বার্থে বাঝছে! তোমার যত বাজে কথা!—মানে (হঠাৎ জোর পাইয়া) রঞ্জনকে ভাল করে লক্ষ্য করেছ? কর নি। করলে এ প্রশ্ন করতে না।

মিসেস রায়। কেন কি হয়েছে রঞ্জনের।

রায়। দেখ নি, রঞ্জন এ জগতের লোক নয়! তোমার আমার পায়ের তলায় যে ইঁট, কাঠ, লোহার কঠিন দুনিয়া, তার সঙ্গে ওর কোন সম্পর্ক নেই! দেখ নি, সে বাস করে তার স্বপ্নের পৃথিবীতে, যেখানে প্রত্যেকটি লোক ওরই মত সরল, সৎ! বাস্তবের একটা কঠিন আঘাত

সহ্য করতে পারবে ও? একেবারে ভেঙে পড়বে! তখন? সুমিত্রার অবস্থা কি হবে একবার ভেবে দেখেছ কি?

মিসেস রায়। কিন্তু সুমিত্রার দিকটাও ভেবে দেখতে হবে। সুমিত্রা যদি রঞ্জনকে—

রায়। (বাধা দিয়া) তুমি কি পাগল হলে নাকি? সুমিত্রার সঙ্গে রঞ্জনের দেখা হয়েছে মাত্র দুদিন।

মিসেস রায়। কিন্তু তুমি নিজের কথা ভুলে যাচ্ছ। রঞ্জনের সঙ্গে মাত্র দশ মিনিট কথা কইতে না কইতে, তুমিও তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলে!

রায়। হ্যাঁ, তার কথা বলার ধরণ আমাকে খানিকটা অবাক করে দিয়েছিল! কিন্তু সেটা আর এটা অনেক তফাৎ। তুমি ভুল করেছ অপর্ণা—সুমিত্রা রঞ্জনকে ভালবাসতে পারে না। দেখ নি, ও ওকে কিরকম ঠাট্টা করছিল?

মিসেস রায়। ঠাট্টা করছিল? কিন্তু আমার যেন মনে হ'ল—

রায়। (ব্যগ্র ভাবে) তোমার কিছু মনে হয় নি অপর্ণা! ওটা তোমার একটা বাই। রঞ্জনকে তুমি অতিরিক্ত স্নেহ কর, তাই তোমার ও কথা মনে হয়েছে। আমার তো মনে হয় সমরকে বিয়ে করতে সুমিত্রার খুব বেশী অমত হবে না—

মিসেস রায়। তাহলে আমারও অমত নেই। সমর সত্যিই ছেলে হিসাবে খারাপ নয়। তবে ও কথাগুলো সত্যি হলে আমি কিন্তু ওখানে মেয়ের বিয়ে দেব না!

রায়। সে তো আমি বলেছি, আমি প্রমাণ করে বিয়ে দেব! তুমি কোথাও বেরুচ্ছ না কি?

মিসেস রায়। হ্যাঁ, একবার আশ্রমে যাব, মায়ের কাছে হরিশের জন্যে পুজোটা দিয়ে আসি—

রায়। তুমি তাহলে একবার সুমিত্রাকে পাঠিয়ে দাও। দেখো, ও যেন একা আসে—

মিসেস রায়। আচ্ছা—(বাড়ির ভিতর চলিয়া গেলেন)

রায়। (পাইপ ধরাইয়া, অন্যমনস্কভাবে) কিন্তু সুমিত্রা রঞ্জনকে—না না, এ অসম্ভব—মোটে দুদিন তাদের মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে—কটা কথাই বা হয়েছে তাদের মধ্যে—না না, এ হতে পারে না—(সুমিত্রার প্রবেশ)

সুমিত্রা। তুমি আমায় ডাকছিলে বাবা ?

রায়। (ঈষৎ ইতঃস্তত করিয়া)—আমি বলছিলাম কি মা—মানে—

সুমিত্রা। (গম্ভীরভাবে) তুমি যা জিজ্ঞেস করবে বাবা, তা আমি জানি—কিন্তু তা হয় না বাবা !

রায়। (গম্ভীর স্বরে) কেন হয় না সুমিত্রা ? তোমার দিক থেকে কোন আপত্তি আছে কি ?

সুমিত্রা। আমার কথা ছেড়ে দাও বাবা—তোমার কথাই ধর ! সমরের সম্বন্ধে ঐ সব কথা শোনবার পরও তুমি তার হাতে মেয়ে দিতে রাজী আছ ?

রায়। ওসব কথা মিথ্যে, সুমিত্রা। আমি জানি সমর ও ধরণের ছেলেই নয় ! আমি তোমার মাকে বলেছি, আমি প্রমাণ করে দেব, চিত্রার কথার একবর্ণও সত্যি নয় ! সে প্রমাণ আমি পেয়েছি !

সুমিত্রা। (মুহূর্তের জন্য তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল) মিথ্যে ! তুমি প্রমাণ পেয়েছ ! (পরমুহূর্তে অস্বাভাবিক জোরের সহিত) হয়ত মিথ্যে—কিন্তু আমার নিজের দিক থেকেও আপত্তি আছে বাবা !

রায়। (অল্প বিরক্তিমিশ্রিত স্বরে) ওটা ক্ষণিকের মোহ মা, দুদিন যেতে না যেতেই কেটে যাবে !

সুমিত্রা। ওটা তোমার বোঝার ভুল বাবা। তুমি নিজের দিকটাকেই বড় করে দেখছ!

রায়। (ক্রুদ্ধ স্বরে) সুমিত্রা!

সুমিত্রা। (গম্ভীরভাবে) আমি সব জানি বাবা—

রায়। (উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে) জান যখন, তখন সব ভাল করেই জেনে নাও মা! আমার সব কিছুই মহিমের হাতে চলে গিয়েছিল। সমরই আমাকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করেছে। আজ আমি দাঁড়িয়েছি বটে, কিন্তু সমরের কাছে আমার অনেক টাকা দেনা। আর তাছাড়া সমর তোমাকে ভালবাসে মা—সেই আমাকে তার বাবার কাছে পাঠিয়েছিল। তোমাদের বিয়েটা হয়ে গেলে, আমি, আবার নিশ্চিন্ত হয়ে কাজে লাগতে পারি।

সুমিত্রা। (কাতর স্বরে) কিন্তু বাবা, নাই বা থাকল তোমার টাকা-পয়সা? নাই বা থাকল তোমার ব্যবসা? তুমি, আমি আর মা—

রায়। (বাধা দিয়া) সে হয় না মা! নিজের হাতে আমি এই ব্যবসা, এই প্রতিপত্তি গড়ে তুলেছি! আজ এসব ছাড়া আমি নিজে বেঁচে আছি, এ কল্পনাও আমি করতে পারি না! লোকে যোগেন চৌধুরীর পরেই আমার নাম করে। পাশের রাস্তা দিয়ে লোকে যেতে যেতে বলে, "দেখেছ টি, এন, রায়ের বাড়ি!" এ বৈভব, এ ঐশ্বর্য, কিছুই থাকবে না—লোকে রাস্তায় আঙুল দেখিয়ে বলবে— "দেখেছিস, লোকটা পথের ভিখিরী, দেউলে, শেয়ার মার্কেটে সব লোকসান গেছে!" সে আমি পারব না মা—

সুমিত্রা। কিন্তু বাবা—

রায়। (বাধা দিয়া) এর মধ্যে কোন কিন্তু নেই মা। তুই রাজী হ। আজও তুই আর সমর ছাড়া এ সব কথা কেউ জানে না—তোর

মাও নয়, এমন কি যোগেন চৌধুরীও নয়! ভেবে দেখ সুমিত্রা, এই বিলাস, এই বিভব, এর মধ্যে মানুষ হয়েছিস বলেই আজ তুই এমন স্বাধীনভাবে নিজের কথা বলতে পারছিস। তোর ক্ষণিকের একটা মোহের জন্যে তুই এই সব আমায় বিসর্জন দিতে বলিস মা? কোথায় নেমে গিয়েছিলাম, আজ আবার উঠতে আরম্ভ করেছি। আমি জানি পাঁচ ছ বছরের মধ্যে সমরের দেনাও শোধ হয়ে যাবে। তারপর একদিন তোদেরই সন্তান-সন্ততির হাতে নিজের হাতে গড়ে তোলা এই বৈভব তুলে দিয়ে যাব!

সুমিত্রা। কিন্তু বাবা, এ টাকা হয় তো তুমি আর একজনের কাছ থেকেও পেতে—

রায়। (মৃদু হাসিয়া) আমি জানি মা, তুই কার কথা বলছিস। কিন্তু আমার যত টাকার দরকার রঞ্জনের সমস্ত সম্পত্তি বেচলেও তত টাকা হবে না!

সুমিত্রা। (ক্রুদ্ধ ও অশ্রুভারাক্রান্ত স্বরে) কিন্তু তাই বলে তুমি আমাকে বিক্রি করবে বাবা?

[রায়ের মুখের উপর কে যেন চাবুক মারিল। তাঁহার মুখ পাংশু ও বিবর্ণ হইয়া উঠিল।]

রায়। (শুষ্ককণ্ঠে) বিক্রি! না না, মা, তার দরকার নেই! আমার নিজের উপায় আমি নিজেই করে নিতে পারব।

[রায় আনত-মুখে উদ্যান হইতে বাহির হইবার জন্য অগ্রসর হইলেন]

সুমিত্রা। (ছুটিয়া রায়ের নিকট গিয়া, অশ্রুভারাক্রান্ত স্বরে) তুমি আমায় ক্ষমা কর বাবা! ও কথা বলার আমার ইচ্ছে ছিল না। হয়ত তোমার কথাই ঠিক—হয়ত আমি নিজেই ঠিক জানি না! তবু—তবু তুমি আমাকে আজকের রাতটা ভাবতে সময় দাও বাবা—

রায়। (তাঁহার মুখ পুনরায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সুমিত্রার

চিবুক স্পর্শ করিয়া) আমি জানতাম মা, তুই তোর ভুল বুঝতে পারবি। বেশ তো, তুই আমাকে কাল সকালেই ভেবে জবাব দিস। তবে একটু ভাল করে ভেবে দেখিস মা! দেখবি, আমার কথাই ঠিক বলে মনে হবে। দেখবি, ওটা তোর ক্ষণিকের মোহ ছাড়া আর কিছুই নয় —(ভিতরের দরজা দিয়া কথা বলিতে বলিতে রঞ্জন ও সমরের প্রবেশ)

সমর। না না, রঞ্জনবাবু, এ আপনি ভুল করছেন। হরিশের রোগের জন্যে দুঃখ আমারও হয়েছে। কিন্তু তাই বলে এটা আমি কিছুতেই মানব না যে, হরিশের দুঃখ-কষ্টের জন্য আমরা দায়ী। আপনিই বলুন কাকা, হরিশের দুঃখ-কষ্টের জন্যে কি আমরা দায়ী ?

রায়। (অল্প বিরক্তি-মিশ্রিত কণ্ঠস্বরে) না রঞ্জন, এ তোমার ভুল! এই পৃথিবীতে সুখ পেতে গেলে শক্তি অর্জন করা চাই। হরিশ দুঃখ পেয়েছে এটা তার অক্ষমতারই প্রমাণ!

রঞ্জন। (মৃদু হাসিয়া) আমার তো মনে হয় ভুল আপনাদেরই হচ্ছে সমরবাবু। সুযোগ পায় নি, অবস্থা অনুকূল ছিল না, তাই তো সুখী হতে পারে নি।

সমর। (উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে) কিন্তু সুযোগ কি কেউ কাউকে করে দেয় রঞ্জনবাবু ? সুযোগ করে নিতে হয়।

রঞ্জন। (মৃদু হাসিয়া) কিন্তু আমি তো সুযোগ করে নিই নি— সুযোগ আপনি এসে আমার কাছে ধরা দিয়েছে।

রায়। আমি কিন্তু কপর্দকশূন্য অবস্থা থেকে আরম্ভ করেছি রঞ্জন—

রঞ্জন। (পূর্ববৎ মৃদু হাসিতে হাসিতে) আরম্ভ করার মত অবস্থাও আপনার ছিল। আর সমরবাবু তো নিজে আরম্ভ করেন নি—ওঁর বাবাই আরম্ভের কাজটা সেরে রেখেছিলেন।

সমর। (উত্তেজনায় মুখ-চোখ লাল হইয়া উঠিয়াছে) কিন্তু

আমাদের পাশের বাড়ীর সি, কে, দাস, তিনি তো শুনেছি প্রথম জীবনে মোট বইতেন ?

রঞ্জন। কিন্তু মোট বইবার মত স্বাস্থ্যটাও হরিশ পায় নি।

সুমিত্রা। তার জন্যে আমরা দায়ী নই! ভাগ্য তাকে সে সম্পদ থেকে বঞ্চিত করেছে—

রঞ্জন। ভুল করছেন সুমিত্রা দেবী! আপনার আমার মতই জীবন্ত হয়ে জন্মেছিল সে। কিন্তু ভালভাবে খেয়ে পরে বাঁচবার সুযোগ সে পায় নি—তাই না তাকে অকালে ঐ রোগে ধরেছিল—

সমর। জীবনটা ঘোড়দৌড়ের মত রঞ্জনবাবু—ফিরে তাকাবার সময় কই! সকলেই চাইছে win, place কেউ চায় না।

রঞ্জন। ভুল সমরবাবু ভুল! হরিশদের অনেকেই win চায় নি, ধীরে-সুস্থে একটা place নিতে পারলেই ওরা যথেষ্ট মনে করত! কিন্তু তাও ওরা পেল না—প্রথম বেড়াটা লাফাতে গিয়েই পড়ে গেল!

সুমিত্রা। কিন্তু তার জন্যে দায়ী—

রঞ্জন। (শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠস্বরে) দায়ী আমরা সুমিত্রা দেবী। ভেবে দেখেছেন, কেন ওদের ক্ষমতার অভাব ? কেন জানেন ? কারণ, আমাদের অভিধানে অপর্যাপ্ত বলে কোন কথা নেই—সম্ভোগে তৃপ্তি আমাদের নেই! আজকের দিনে অর্থই দেয় সুখ, শক্তি। মুষ্টিমেয় যে কজন আমরা win-এর জন্যে লালায়িত, এই শক্তি আমরা অর্জন করি অজস্র পরিমাণে। কখনও মনে হয় না,—যা আমরা পেয়েছি তা পর্যাপ্ত—এর বেশী আর প্রয়োজন নেই।—এবার বাকীটা, যারা প্রথম বেড়া লাফাতে গিয়ে পড়ে গেছে, তাদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া যাক। তারাও শক্তি অর্জন করুক।—তারা এলে —এই হরিশ যতীনের দল এলে—এক সঙ্গে হাত ধরে এগিয়ে যাব

আমরা win-এর দড়ির দিকে। তখন আর কেউ place-এ নয়, সবাই win, সবাই win!

রায়। তা হয় না রঞ্জন। জীবনের ধর্ম্মই হল competition—এটা competition এর যুগ।

রঞ্জন। কক্ষনো না! আজকের জরাগ্রস্ত সভ্যতার বিষফল এই বেঁচে থাকার জন্যে competition! competition নিয়ে মানুষ পৃথিবীতে জন্মায় নি—পরে তৈরী হয়েছে এই competition। লোভ তৈরী করেছে এই competition কে, স্বার্থ তৈরী করেছে এই competitionকে! অথচ মানুষ এ রকম নয়। বিশ্বাস করুন আমার কথা—আপনারা এ রকম নন্, আমি এ রকম নই! কি গভীর বেদনাবোধ এই মানুষের! হ্যাঁ হ্যাঁ—বিশ্বাস করুন আমার কথা—প্রত্যেক মানুষের—আমি, আপনি, সমরবাবু—আমাদের সকলের! আমরা যখন win-এর নেশায় কোন দিকে না তাকিয়ে এগিয়ে যাই, তখন আমাদেরও পেছন দিকে টানে হরিশদের ঐ হাহাকার, ওদের ওই ক্রুদ্ধ দাবি! তখন আমরা নিজেদের ধাপ্পা দিই, বিবেককে চাপা দিই "এটা competition-এর যুগ" এই কথা বলে! [রঞ্জনের সর্বাঙ্গ প্রবল উত্তেজনায় কম্পিত হইতেছিল। রায়, সমর সুমিত্রা স্তব্ধ বিস্ময়ে তাহার দিকে তাকাইয়া ছিলেন। রঞ্জনের অবস্থা দেখিয়া প্রথম চমক ভাঙ্গিল সমরের।]

সমর। (ভীত স্বরে) রঞ্জনবাবু—আপনার সর্বাঙ্গ কাঁপছে!

রঞ্জন। (ক্রন্দনজড়িত কণ্ঠস্বরে) আমি স্থির থাকতে পারছি না, সমরবাবু! ভাবুন তো একবার—পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব এই মানুষ! কি গভীর ভালবাসা তাদের মধ্যে, কত যুগ যুগান্তরের এই আত্মীয়তা-বন্ধন! কত সুখ, কত শান্তি, যুগে যুগে কত আত্ম-বলিদান! কত খ্রীষ্ট ক্রুশে প্রাণ দেয় মানুষের পরিত্রাণের জন্যে, কত বুদ্ধ সংসার

ত্যাগ করে তাদের মুক্তির জন্যে, কত চৈতন্য জগাই মাধাইয়ের হাতে নির্যাতিত হয় মানুষকে ভালবেসে! তবু কেন এই লোভ, এই স্বার্থের সংঘাত—এই যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, পররাজ্য-লোভ? তবু কেন এই যুডাস, এই অজাতশত্রু, এই জগাই-মাধাইয়ের দল—বলতে পারেন? কেন? কেন? কেন?—[রঞ্জনের দুই চোখ দিয়া নির্গত হইতেছিল অশ্রুধারা। রায়, সুমিত্রা ও সমর নির্বাক বিস্ময়ে তাহাকে দেখিতেছিলেন। কাহারও মুখে কোন কথা ছিল না। ইতিমধ্যে চিত্রা বাগানের দরজা ঠেলিয়া প্রবেশ করিয়াছে, কেহই লক্ষ্য করেন নাই। চিত্রাও অবশ্য রঞ্জনের ভাব-বৈলক্ষণ্য লক্ষ্য করে নাই, তাহার কোন কথাও শুনিতে পায় নাই। সে সোজা সমরের নিকট চলিয়া আসিল। রঞ্জনের স্বাভাবিক অবস্থা ক্রমশ ফিরিয়া আসিতেছিল। রায় হতভম্বের মত চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার মুখ দিয়া অস্ফুট স্বরে বাহির হইল—"চিত্রা!"—সুমিত্রার মুখে কোন ভাব-বৈলক্ষণ্য দেখা গেল না। সমরের মুখের ভাব কঠিন হইয়া উঠিল।]

চিত্রা। এই যে সমর—একবার টাকার কথা মনে করিয়ে দিয়েছি, তাইতেই এই? একেবারে ওদিক মাড়ান ছেড়ে দিলে!

সমর। (ক্রুদ্ধ অথচ গম্ভীর স্বরে) তোমাকে আমি চিনি না, কিন্তু তোমার মত মেয়েদের চিনি—আর তাদের শায়েস্তা করি চাবুক মেরে।

চিত্রা। (অস্বাভাবিক ক্রোধে তাহার মুখের ভাব বিকৃত হইয়া উঠিয়াছে) ঠিক যেমন তোমার বাবাকে আমি একবার করেছিলাম! আরে অবাক হয়ে যাচ্ছ যে! বিশ্বাস না হয় রায়কে জিজ্ঞেস করে দেখ একবার! (সমরকে ধীর পদক্ষেপে চিত্রার দিকে অগ্রসর হইতে দেখা গেল।)

রায়। চিত্রা।

চিত্রা। ধমকালে কি হবে রায়। দেখছ না, সমর যে শুনতে চাইছে? মনে নেই তোমার? যোগেন চৌধুরী বড় বেশী মাতলামো করছিল, আমাকে চাবুক আছড়াতে দেখে তবে থামে! মনে নেই রায়? (সমর চিত্রার আরও নিকটে অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে। হঠাৎ রঞ্জন ছুটিয়া আসিয়া চিত্রার সম্মুখে দাঁড়াইল।)

রঞ্জন। (সমরের দিকে ফিরিয়া) চিত্রা অসুস্থ—আপনি ওকে ক্ষমা করুন সমরবাবু। (চিত্রাকে) চিত্রা তুমি ভুল করেছ। সুমিত্রা দেবীর সঙ্গে কোনদিনই আমার বিয়ে হবে না—আমি তাঁর যোগ্য নই। (চিত্রা পিছু হটিতে আরম্ভ করিয়াছিল। (চিত্রাকে ধরিয়া) চিত্রা, তুমি আমায় গ্রহণ কর—করবে চিত্রা—বল গ্রহণ করবে—বল —(সমর রঞ্জনকে উত্তেজিত অবস্থায় তাহার ও চিত্রার মাঝখানে ছুটিয়া আসিতে দেখিয়া ও তাহার কথা শুনিয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিল। সুমিত্রা ও রায় বিস্মিত দৃষ্টিতে এদিকে তাকাইয়া ছিলেন)

চিত্রা। (রঞ্জনের স্পর্শে ভাবাবেশে তাহার দুই চক্ষু প্রায় বুজিয়া আসিয়াছিল। আবেগ কম্পিত কণ্ঠস্বরে) আঃ, দেহ যেন আমার জুড়িয়ে গেল! কত লোক ছুঁয়েছে আমাকে, তাদের ছোঁয়া আমার দেহে মনে ধরিয়েছে জ্বালা! আর আজ! আজ এ যেন চন্দনের প্রলেপ!— (রঞ্জনের মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া)—রঞ্জন—রঞ্জু আমার—

রঞ্জন। (স্নিগ্ধ স্বরে) বল চিত্রা—

চিত্রা। কেউ তোমাকে কোনদিন বলে নি রঞ্জন—তুমি রূপকথার রাজকুমার?—রূপকথার দেশ থেকে এসেছ ঘুমন্ত রাজকন্যার ঘুম ভাঙাতে?

রঞ্জন। সমরবাবুর কাছে মাফ চাইবে না চিত্রা?

চিত্রা। নিশ্চয় চাইব। তুমি যে চাইতে বলছ রঞ্জন! (প্রায় রঞ্জনের পায়ের উপর পড়িয়া, অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠস্বরে) তুমি আমায় ক্ষমা কর বন্ধু—তোমার ক্ষমা আমায় নির্মল করে তুলুক।

রঞ্জন। (চিত্রাকে তুলিয়া) ওঠ চিত্রা—আমার কাছে তুমি কোনদিন কোন অপরাধ কর নি, করতে পার না। সমরবাবু তোমার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন—তাঁর কাছে ক্ষমা চাও চিত্রা—

সমর। তার আর প্রয়োজন হবে না রঞ্জনবাবু। ওঁকে বলে দেবেন ওঁর ওপর আমার এতটুকু বিদ্বেষ নেই—(চিত্রাকে উচ্ছ্বসিত হইয়া ক্রন্দন করিতে দেখিয়া সুমিত্রা আসিয়া চিত্রাকে লইয়া সেডের নীচে একখানি চেয়ারে বসাইয়া দিল। চিত্রা টেবিলে ভর দিয়া দুই বাহুর মধ্যে মুখ লুকাইয়া আকুল হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল।)—আচ্ছা এখন তাহলে চলি রঞ্জনবাবু—তবে আমার একটা অনুরোধ ছিল আপনার কাছে—

রঞ্জন। বলুন—

সমর। আপনি মর্তের মাটিতে নেমে আসুন রঞ্জনবাবু। জানবেন, খ্রীষ্ট ক্রুশে প্রাণ দিয়েছেন, তবু মানুষ পাপমুক্ত হয়নি! বুদ্ধ সংসার ত্যাগ করেছেন, তবু আজও মানুষ পায়নি তার আকাঙ্খিত নির্বাণ! এখনও পৃথিবী যুডাসের, অজাতশত্রুর, জগাই-মাধাইয়ের—

রঞ্জন। (মৃদু হাসিয়া) আমি মানুষ সমরবাবু। মানুষকে আমি বিশ্বাস করি। দেখলেন না, কত সহজে চিত্রা আপনার কাছ থেকে ক্ষমা পেল! পাবে না, আপনি যে পৃথিবীর মহত্তম জীব—ক্ষমার শিক্ষা যে আপনার রক্তে!

সমর। কি জানি—হয়ত আপনার কথাই ঠিক! কিন্তু আমি মানতে পারলাম না রঞ্জনবাবু! আমার মনে হয়, পৃথিবী পৃথিবী, স্বর্গ-রাজ্য নয়। আচ্ছা নমস্কার।—(প্রতিনমস্কার করিয়া রঞ্জন সেডের

নীচে চিত্রার নিকট চলিয়া গেল। রঞ্জনকে আসিতে দেখিয়া স্থমিত্রা চিত্রাকে ছাড়িয়া রায় ও সমরের দিকে চলিয়া আসিল)

সমর। (রায়কে) আমি তাহলে এখন চলি কাকা—

রায়। আমিও তোমার সঙ্গে যাব সমর।—(স্থমিত্রার নিকট আসিয়া) আর নিশ্চয় তোর মনে কোন দ্বিধা নেই মা ?

স্থমিত্রা। আমি তো বলেছি বাবা, আজকের দিনটা আমায় ভাববার সময় দাও শুধু আজকের দিনটা !

রায়। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া) তবে তাই হ'ক মা, কাল সকালেই আমায় জবাব দিস ! (রঞ্জনকে) তোমরা যাবে নাকি রঞ্জন ? তাহলে তোমাদের আমি নামিয়ে দিয়ে যাব—

স্থমিত্রা। তুমি যাও বাবা। রঞ্জনবাবুর সঙ্গে আমার একটু দরকার আছে—

রায়। (চিত্রার দিকে ইঙ্গিত করিয়া) কিন্তু মা, তোমার মা যদি এসে পড়েন—

স্থমিত্রা। সে আমি সামলে নেব বাবা। হ্যাঁ, ভাল কথা—আজ আমি তোমাদের সঙ্গে পার্টিতে যেতে পারব না বাবা—

রায়। কিন্তু মা—সলিল যে বড় দুঃখ করবে—

স্থমিত্রা। কোন উপায় নেই বাবা। আজ সন্ধ্যে বেলায় আমাকে একা থাকতেই হবে এই বাড়িতে। আজ আমি আমার নিজের সঙ্গে শেষ বোঝাপড়া করব ! তুমি আর মা চলে যেও—বলো আমার শরীর খারাপ করেছে—

রায়। বেশ, তাই হবে মা। এস সমর—(বাড়ির ভিতরে যাইবার দরজা দিয়া রায় ও সমরের প্রস্থান।)

[স্থমিত্রা রঞ্জনের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল।]

রঞ্জন। ওঠ চিত্রা, মুখ তোল! তোমার কিসের লজ্জা? তুমি যে অপাপবিদ্ধা—

চিত্রা। (মুখ তুলিয়া, ক্রন্দনজড়িত কণ্ঠস্বরে) সে তোমার কাছে রঞ্জন—তোমার কাছে কোন লজ্জা আমার নেই! সত্যি তুমি আমায় নেবে রঞ্জন? আমি তোমার কাছে নিজেকে উজাড় করে দেব! (কথা বলিতে বলিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। উত্তেজনায় তাহার সর্বাঙ্গ কম্পিত হইতেছে)—বল—সত্যি করে বল রঞ্জন—সত্যি তুমি আমায় নেবে? (হঠাৎ সচকিত হইয়া) কিন্তু এ আমি কি বলছি?—আমার পায়ের তলায় মাটি সরে যাচ্ছে! আমি তোমার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি রঞ্জন!—তুমি আমায় টানছ রঞ্জন, আমি তোমার সঙ্গে মিশে যাব! (উচ্ছ্বসিত হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে) ওগো, তোমরা আমায় এখান থেকে নিয়ে চল! নইলে পাথরের ঠাকুর আমার মাটিতে নেমে আসবে!—আনন্দ কোথায় তুমি—আনন্দ—(চীৎকার করিয়া ডাকিতে ডাকিতে বাগানের দরজার দিকে অগ্রসর হইল। অবস্থা উদভ্রান্তের ন্যায়। আনন্দকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া)—এতক্ষণ কোথায় ছিলে আনন্দ?

আনন্দ। (চিত্রাকে ধরিয়া) তোমার ডাকের অপেক্ষায় ছিলাম চিত্রা। তুমি যে বলেছিলে দরকার হলে আমাকে ডাকবে—

চিত্রা। তাই বলে এত দেরী করতে হয়! সেই কখন থেকে তোমাকে ডাকছি। (হঠাৎ আনন্দর মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া)—আমাকে বিয়ে করবে বলেছিলে—করবে? আজই?

আনন্দ। এ প্রশ্নের জবাব আমি তোমার কাছে কতদিন ধরে চাইছি চিত্রা—কিন্তু আজও পাই নি! আমাকে আবার মিথ্যে আশা দিচ্ছ চিত্রা?

চিত্রা। না না, মিথ্যে নয় আনন্দ—তুমি সব ব্যবস্থা কর! কিন্তু বিয়ে হবে আমাদের মহালগ্নে—রাত বারটায়।

আনন্দ। (আবেগ-কম্পিত স্বরে) তাই হবে চিত্রা।

চিত্রা। হ্যাঁ—ঐ পরম লগ্নে হবে আমাদের বিয়ে! কোন আলো জ্বলবে না, কোন শঙ্খ-ধ্বনি হবে না, কেউ উলু দেবে না! ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে থাকবে রঞ্জন, ঘুমিয়ে থাকবে সমস্ত পৃথিবী! অন্ধকারে হবে তোমার আমার বিয়ে, আর ঐ অন্ধকারে বাসর জাগব শুধু তুমি আর আমি!

আনন্দ। বুঝেছি চিত্রা—অন্তত বিয়ের রাতে আমাকে বিয়ে করার লজ্জা থেকে মুক্তি পেতে চাও! বেশ তাই হবে, অন্ধকারেই বসবে আমাদের বিয়ের বাসর। (আনন্দ চিত্রাকে লইয়া বাগানের দরজা দিয়া বাহির হইয়া যাইতেছিল। এমন সময় সুমিত্রা আসিল তাহার নিকট।)

সুমিত্রা। আপনার সঙ্গে আমার একটা প্রয়োজন ছিল আনন্দ বাবু—

আনন্দ। প্রয়োজন? আপনার? আমার সঙ্গে? (এক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া) আচ্ছা আমি এঁকে বাড়ি পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করেই আসছি।—(আনন্দ ও চিত্রা বাগানের দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেল।)

সুমিত্রা। (রঞ্জনের নিকট আসিয়া) আচ্ছা রঞ্জন বাবু, আপনি রিভলভার ছুঁড়তে পারেন?

রঞ্জন। (মৃদু হাসিয়া) কি জানি, কখনও ছুঁড়ে দেখি নি—

সুমিত্রা। রিভলভার কি করে লোড করতে হয় জানেন?

রঞ্জন। শুনেছি, কিন্তু কখন লোড করি নি—

সুমিত্রা। শিখবেন, আমার কাছ থেকে?

রঞ্জন। না।

সুমিত্রা। কেন, জানতে পারি কি?

রঞ্জন। কোনদিন দরকার হবে না বলে।

সুমিত্রা। (উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে) কোনদিন দরকার হবে না? আত্মরক্ষার জন্যেও নয়?

রঞ্জন। আত্মরক্ষার জন্যে আমার ব্যক্তিত্ব, আমার যুক্তিই যথেষ্ট। তা যদি আমাকে বাঁচাতে না পারে, তাহলে বুঝব, বাঁচবার মত ব্যক্তিত্ব বা যুক্তি কোনটাই আমার নেই।

সুমিত্রা। কিন্তু আক্রমণকারী যদি মূর্তিমান অযুক্তি হয়, তখন?

রঞ্জন। তাকেও যুক্তি দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করব। তা যদি না পারি, তবে বুঝব, আমার যুক্তির এমন শক্তি ছিল না, যে তার অযুক্তিকে জয় করতে পারে।

সুমিত্রা। কিন্তু তার চেয়ে অযুক্তিকে মেরে ফেলাই ভাল নয়?

রঞ্জন। (মৃদু হাসিয়া) তাহলে আমাকেও যে একজন না একজনের হাতে মরতে হবে। আমিও যে তখন মূর্তিমান অযুক্তি।

সুমিত্রা। (ক্রমশঃ উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছিল) কিন্তু সম্মান! ধরুন কেউ যদি আপনার আত্মসম্মানে ঘা দেয়? কেউ যদি আপনাকে অপমান করে? মনে করুন, আজ সমর যদি আপনাকে অপমান করত? মনে করুন কোন মেয়েকে আপনি ভালবাসেন। সেও আপনাকে চায়। কোন তৃতীয় ব্যক্তি আপনাদের মাঝে এসে তাকে আপনার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিল। আপনার আত্মসম্মানে ঘা লাগবে না তাতে? রাগ হবে না আপনার? মনে হবে না, ও লোকটাকে আপনি ক্ষমা করতে পারেন না? মনে হবে না, ওকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবেন?

রঞ্জন। (আবেগব্যাকুল কণ্ঠস্বরে) কিন্তু আমার তো তার ওপর রাগ হয় না মিস রায়। বড় দুঃখ হয় তাকে দেখলে। না পাওয়ার দুঃখ যে তার মনকে করে তুলেছে বিকারগ্রস্ত। তাই না সে

জোর করে ছিনিয়ে নিতে আসে। তাই না সে আমাকে, মানে আর একজন মানুষকে অপমান করতে পারে। রাগ যে তার ওপর আমি করতে পারি না। মনে হয় শুশ্রূষা করে তাকে নীরোগ করে তুলি। কামনা করি—প্রাণপণ চেষ্টা করি সে যেন তার ভুল করে চাওয়ার হাত থেকে মুক্তি পায়।—কিন্তু—(হঠাৎ আপন মনে হাসিয়া উঠিল।)

সুমিত্রা। (বিস্মিত হইয়া) কিন্তু কি, রঞ্জন বাবু?

রঞ্জন। ভাবছি, এসব অবান্তর আলোচনা কেন করছি। আমি তো জানি, আপনার ভালবাসা পাবার যোগ্যতা আমার নেই।

সুমিত্রা। (গম্ভীর ভাবে, মনে হইল যেন উদ্গত অশ্রুর বেগ কোনমতে রোধ করিতেছে) কিন্তু আমার কথা তো আমি আপনাকে বলি নি—

রঞ্জন। (অপ্রস্তুত ভাবে) ওঃ তাই তো! দেখেছেন, কি ভুল? আপনি তো যে কোন এক মেয়ের কথা বলছিলেন। আমার কিন্তু কি জানি কেন মনে হয়েছে, আপনি আপনার কথাই বলছেন। আমার ঔদ্ধত্য, আমার নির্বুদ্ধিতা আপনি ক্ষমা করে নেবেন মিস রায়!

সুমিত্রা। আমার একটা কথা রাখবেন রঞ্জনবাবু? আজ রাত নটায় এখানে—এই বাগানে একবার আসবেন!

রঞ্জন। নিশ্চয় আসব! কিন্তু কেন জানতে পারি কি?

সুমিত্রা। এই মাত্র আপনি বললেন না—"আমি তো জানি"! আমার মনে হয় আপনি ঠিক জানেন না। এই জানা না জানার দোটানার নিষ্পত্তি হয়ে যাবে! আসবেন তো রাত নটার সময়?

(সুমিত্রা ভিতরে যাইবার দরজার দিকে অগ্রসর হইল)

রঞ্জন। কিন্তু সুমিত্রা—মানে—

সুমিত্রা। (প্রস্থানোদ্যত অবস্থায়) না, এখন আর কোন কথা নয়, রঞ্জনবাবু—রাত নটায়। হ্যাঁ ভাল কথা—আনন্দবাবুকে আসতে

বলেছি, তাঁর হাত দিয়ে একটা চিঠি পাঠাব। তিনি এলে একটু অপেক্ষা করতে বলবেন—কেমন? (বাড়ির ভিতর চলিয়া গেল)

(বাগানের দরজা দিয়া আনন্দর প্রবেশ)

রঞ্জন। এই যে আনন্দ, মিস রায় তোমাকে অপেক্ষা করতে বলে গেছেন—তিনি এখনি আসবেন। (আনন্দর নিকট আসিয়া তাহার তুই কাঁধের উপর হাত রাখিয়া উদ্বেগাকুল কণ্ঠস্বরে) চিত্রাকে কোথায় রেখে এলে ভাই?

আনন্দ। (হাত সরাইয়া দিয়া ক্রুদ্ধস্বরে) তার জন্যে তোমার না ভাবলেও চলবে রঞ্জন।

রঞ্জন। তুমি আমার ওপর এখনও রাগ করে আছ আনন্দ! তুমি তো জান তুমি যা ভেবেছিলে সব মিথ্যে। তবে কেন এই বিদ্বেষ? ছুরি নিয়ে আমায় মারতে এসেছিলে বলে? কিন্তু সে তো আমি জানি, ওসময় তুমি প্রকৃতিস্থ ছিলে না। কিন্তু এখন—এখন তো বুঝতে পেরেছ, তুমি যা ভেবেছিলে সব ভুল? তবে কেন আমরা তুজনে তুজনকে আরও নিবিড় ভাবে পাব না।

আনন্দ। (ক্রুদ্ধস্বরে) রাগ, বিদ্বেষ! কখনও কারো ওপর রাগ তুমি করেছ রঞ্জন? বিদ্বেষ কথাটার কি মানে, তা তুমি জান? কেন সকালে আমার ওপর রেগে ওঠ নি? কেন আমাকে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বল নি? কেন দাও নি আমাকে অকথ্য, অশ্লীল গালাগাল?

রঞ্জন। তাহলে তুমি শান্তি পেতে আনন্দ?

আনন্দ। হ্যাঁ পেতাম। নিজেকে তোমার সামনে এত হীন, এত ছোট বলে মনে হ'ত না।

রঞ্জন। (মৃত্নু হাসিয়া) তুমি মনে মনে আমায় কড় ঘৃণা কর—না আনন্দ?

আনন্দ। ঘৃণা বললে ভুল হয় রঞ্জন। আমি তোমাকে সহ্য করতে পারি না! মোটেই পছন্দ হয় না তোমাকে আমার! তাই বলে তোমার কথা আমি অবিশ্বাস করি না রঞ্জন। আমি জানি, তুমি আমাকে কোনদিন ঠকাবে না—কোনদিন একটা মিথ্যে কথা বলবে না! তবু তোমার বন্ধুত্ব আমি চাই না রঞ্জন, তোমাকে জানতেও চাই না! শুধু চাই তুমি আমার পথ থেকে সরে দাঁড়াও! আমার একটা অনুরোধ রাখবে রঞ্জন? (উত্তেজনায় তাহার সর্বাঙ্গে জাগিয়াছে কম্পন)

রঞ্জন। কি, বল?

আনন্দ। (হাত যোড় করিয়া, কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িল। দুই চোখ দিয়া অবিরলধারায় অশ্রু ঝরিতেছে) তুমি সরে যাও রঞ্জন—আমার ওপর দয়া কর—তুমি আত্মহত্যা কর!

রঞ্জন। (শান্ত, স্নেহপূর্ণ স্বরে) ছিঃ আনন্দ—ওঠ! (আনন্দকে উঠাইয়া) আত্মহত্যা করে মরতে যে আমি পারি না ভাই! সে যে তোমার, আমার, সকলের অপমান—অমৃতের অপমান! আর তাছাড়া তোমার কিসের ক্ষোভ! আমি তো বলেছি, তোমার পথে আমি কোনদিন বাধা হব না—

আনন্দ। (সরিয়া আসিয়া ক্রুদ্ধস্বরে) তুমি আছ—এটাই যে একমাত্র বাধা, এটা বোঝ না কেন নির্বোধ! এই জন্যেই তো আজ সকালে—

রঞ্জন। (বাধা দিয়া) আবার আজ সকালের কথা কেন আনন্দ? আমি তো বলেছি তোমাকে, তোমার মনের অবস্থা বুঝে—

আনন্দ। (রঞ্জনকে কথা শেষ করিতে না দিয়া, ব্যঙ্গের সুরে) পরমুহূর্তে আমাকে ক্ষমা করেছ—এই তো? কে চেয়েছে তোমার ক্ষমা! কি করে জানলে, আমি পরে অনুতাপ করেছি? এমনও হতে পারে, এতটুকু অনুতাপ আমার হয় নি!

রঞ্জন। তাহলেই দেখ আনন্দ, এ বিষয়ে তুমি একেবারে নিশ্চিত নও। এমনও হতে পারে, ওটা তোমার ক্ষণিকের উন্মাদনা ছাড়া আর কিছুই নয়, দিগ্‌বিদিক জ্ঞান তোমার ছিল না। তাহলে আমার অপরাধও তো বড় কম নয় আনন্দ! ষ্টেশনে তোমার মুখ চোখের সামনে ভেসে ওঠার পর থেকেই, আমি তোমাকে সন্দেহ করতে আরম্ভ করেছিলাম! মনে হয়েছিল, খুব শিগ্‌গিরই তুমি আসবে আমার সঙ্গে চরম বোঝাপাড়া করতে! তোমাকে ক্ষমা করার অধিকার তো আমার নেই বন্ধু! হ্যাঁ, তুমি যাওয়ার পর থেকে একটা কথা খালি আমার মনে হচ্ছে—হয়ত চিত্রা তোমাকে সত্যিই ভালবাসে—

আনন্দ। রঞ্জন—তুমি পাগল হয়ে গেছ!

রঞ্জন। না না, পাগল আমি হই নি আনন্দ। নইলে বার বার কেন সে তোমাকে আঁকড়ে ধরবে? তুমি জান না আনন্দ, এক একজনের ভালবাসাই ঐরকম! নিজেও কষ্ট পায়, যাকে ভালবাসে তাকেও কষ্ট দেয়—

আনন্দ। (ব্যঙ্গের সুরে) কিন্তু এক জায়গায় তোমার হিসেবে ভুল হচ্ছে রঞ্জন! তুমি জান কি, চিত্রা রোজ সুমিত্রা দেবীকে চিঠি লেখে—আর মিস রায়ও সে চিঠির জবাব দেন?

রঞ্জন। শুনেছিলাম, কিন্তু বিশ্বাস করি নি! (আর্তস্বরে) এ বাজে কথা আনন্দ, এ অসম্ভব, এ হতে পারে না!

আনন্দ। কিন্তু তাই হয়েছে, আর হচ্ছে! চিত্রা কি লেখে প্রত্যেক চিঠিতে জান রঞ্জন? সে প্রত্যেক চিঠিতে মিস রায়কে অনুরোধ জানায়, তিনি যেন তোমাকে বিয়ে করেন। তার ধারণা মিস রায়ের সঙ্গে বিয়ে হলে তুমি সুখী হবে! আমি জানি না, তুমি চিত্রাকে ভালবাস কিনা, কিন্তু সে তোমাকে এখনও ভালবাসে রঞ্জন। এত ভালবাসা বোধ হয় পৃথিবীতে কেউ কাউকে কোনদিন

বাসে নি! আজ সে উত্তেজনার মাথায় রাজী হয়েছে। নইলে এই সেদিন পর্যন্ত বলেছিল, মিস রায়ের সঙ্গে তোমার যেদিন বিয়ে হবে, ঠিক তার পরদিন সে আমাকে গ্রহণ করবে।

রঞ্জন। (এক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া) আর মিস রায় কি লেখেন কিছু জান আনন্দ?

আনন্দ। চিত্রার কাছে শুনেছি, সুমিত্রা দেবী তোমাকে ভালবাসেন রঞ্জন। এ কি! কি হ'ল রঞ্জন? কাঁপছ কেন? (রঞ্জনের মুখ দেখিয়া মনে হইতেছিল, তাহার মনের ভিতর যেন একটা প্রচণ্ড আলোড়ন চলিতেছে)

রঞ্জন। (কম্পিত কণ্ঠস্বরে) কি জানি আনন্দ—বড় হালকা মনে হচ্ছে নিজেকে—বড় আনন্দ—বড় সুখ—(বাড়ির ভিতর হইতে সুমিত্রাকে আসিতে দেখা গেল। তাহার দৃষ্টি হাতের খোলা চিঠিতে নিবদ্ধ।)

আনন্দ। (অস্ফুটস্বরে) রঞ্জন—মিস রায় আসছেন! (সুমিত্রা নিকটে আসিবার পূর্বেই রঞ্জন নিজেকে আয়ত্তের মধ্যে আনিয়া ফেলিল।)

সুমিত্রা। (পত্রটি ভাঁজ করিয়া আনন্দর হাতে দিয়া) এই চিঠিটা চিত্রা দেবীকে দেবেন। বলবেন, এটা আমার শেষ অনুরোধ।

আনন্দ। আচ্ছা, আমি তাহলে এখন আসি মিস রায়—নমস্কার। (বাগানের দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেল)

সুমিত্রা। (ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া) কই, আপনি তো জিজ্ঞেস করলেন না—কি লিখলাম চিত্রাকে? কেন লিখলাম?

রঞ্জন। তোমার সম্বন্ধে তো আমার কোন কৌতূহল নেই সুমিত্রা—আমি যে তোমাকে ভালবাসি—

সুমিত্রা। রঞ্জনবাবু! রঞ্জন! (নিকটে আসিলে রঞ্জন তাহাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইল।)

সুমিত্রা। (রঞ্জনের বুকে মুখ লুকাইয়া) তাহলে পাথরের ঠাকুর তুমি নও—তোমার মনেও দাগ কাটে রঞ্জন—পাথরের ঠাকুর তুমি নও—(তাহার কণ্ঠস্বর অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া আসিল)

রঞ্জন। (মৃদুস্বরে) চল সুমিত্রা, ভেতরে যাই।

সুমিত্রা। চল—

(সুমিত্রা ও রঞ্জন বাড়ির ভিতর চলিয়া গেল। ধীরে ধীরে দ্বিপ্রহরের পর অপরাহ্ন, অপরাহ্নের পর সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। তাহার পর আসিল রাত্রি! বাহিরের কোন এক ঘড়িতে নটা বাজার শব্দ শোনা গেল। ভিতরের দরজা খুলিয়া সুমিত্রা প্রবেশ করিল, পিছনে রঞ্জন। সুমিত্রা ধীরপদে আসিয়া সেডের আলো জ্বালিয়া দিল। তাহার হাতে একটি ছোট প্যাকেট।)

রঞ্জন। চিত্রাকে আসতে বলে তুমি ভাল কর নি সুমিত্রা—সে বড় অসুস্থ—

সুমিত্রা। (ক্রুদ্ধস্বরে) কেন তোমার তার ওপর এত দয়া বলতে পার রঞ্জন? আমি জানি কেন! তুমি তাকে ভালবাস রঞ্জন!

রঞ্জন। এ তোমার ভুল ধারণা সুমিত্রা! তাকে আমি ভালবাসি, তবে তুমি যে অর্থে বলছ, সে অর্থে নয়। বড় দুঃখ হয় তাকে দেখলে। তার দুঃখ, তার ব্যথা আমাকে অভিভূত করে ফেলে, সুমিত্রা!

সুমিত্রা। আর আমার দুঃখটা বুঝি কিছু নয়? আমার চাওয়াটা বুঝি কিছু নয়? কোথায় নেমে এসেছি আমি, তা তুমি বোঝ রঞ্জন? তারক রায়ের মেয়ে আমি! আমার সমস্ত অহংকার ঘুচিয়ে দিয়ে আজ তার মত একটা মেয়ের সঙ্গে বোঝাপাড়া করতে হচ্ছে—এর বুঝি কোন দাম নেই?

রঞ্জন। (আর্তস্বরে) সুমিত্রা! চিত্রাকে তুমি অন্যায়ভাবে ছোট করছ!

সুমিত্রা। (উত্তেজিত অবস্থায়) কেন করব না। তার প্রত্যেকটা চিঠি আমার মনে জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছে—সে জ্বালার আমি শোধ নেব না!

রঞ্জন। (বিস্মিত হইয়া) কিন্তু আমি তো জানি, সে প্রত্যেক চিঠিতে বার বার করে তোমাকে অনুরোধ করেছে, আমাকে গ্রহণ করবার জন্যে—

সুমিত্রা। (ক্রোধে তাহার মুখের ভাব বিকৃত হইয়া উঠিয়াছে। হাতের প্যাকেটটি রঞ্জনের দিকে ছুঁড়িয়া দিয়া) পড়ে দেখ তার চিঠি! অনুরোধ করেছে! প্রত্যেক চিঠিতে সে আমাকে জানিয়েছে, তুমি তার সম্পত্তি। সে আমাকে দান করেছে মাত্র! কে চায় তার দান? তাকে আজ আমি দেখিয়ে দেব, আমি আমার জোরে তোমাকে পেয়েছি—তার অনুগ্রহে নয়!

(বাগানের ফটক দিয়া চিত্রাকে প্রবেশ করিতে দেখা গেল, পিছনে আনন্দ। আনন্দ প্রবেশ পথের নিকটেই রহিয়া গেল। চিত্রা অগ্রসর হইয়া আসিল সুমিত্রা ও রঞ্জনের দিকে।)

সুমিত্রা। (চিত্রা আসিবার পূর্বেই তাহার নিকট আসিয়া) আমি তোমাকে কেন ডেকে এনেছি, তা তুমি জান নিশ্চয়?

চিত্রা। (শান্ত স্বরে) কি করে জানব? তুমি তো চিঠিতে কিছু লেখ নি।

সুমিত্রা। (ক্রুদ্ধ অথচ মৃদু স্বরে) জান তুমি সব! কেন মিথ্যে ভান করছ?

চিত্রা। (পূর্ববৎ শান্ত স্বরে) ভান করে আমার লাভ?

সুমিত্রা। আমার অবস্থার পুরোপুরি সুবিধেটা নিতে চাও! আরও নীচে আমাকে নামিয়ে আরও কিছুটা তৃপ্তি পেতে চাও!

চিত্রা। তোমার এ অবস্থার জন্যে তুমিই দায়ী। আমি তোমাকে

ডেকে পাঠাই নি। তুমিই আমাকে ডেকে পাঠিয়েছ ঝগড়া করবার জন্যে।

সুমিত্রা। না না, ঝগড়া করবার জন্যে তোমাকে আমি ডেকে আনাই নি। তোমাকে ডেকে আনিয়েছি তোমার চিঠির উত্তর দেব বলে।

চিত্রা। সে উত্তর তুমি তো চিঠিতেই দিয়েছ।

সুমিত্রা। চিঠিতে কিছুই বলা হয় নি! তাই তোমায় ডেকে আনিয়েছি, তোমার সঙ্গে শেষ বোঝাপড়া করব বলে। প্রথম যেদিন আমাদের বাড়ি এসে কেলেঙ্কারি করে গেলে, সেদিনের কথা তোমার মনে আছে?

চিত্রা। আছে।

সুমিত্রা। সেদিন বাড়ি ফিরে এসে আমি সব শুনলাম! বড় দুঃখ হল রঞ্জনের জন্যে—কি সরল বিশ্বাসে সে তোমার পেছনে ছুটে গিয়েছিল। আশা করেছিল, তোমার মত মেয়ে তাকে সুখী করতে পারবে। কত উঁচুতে বসিয়েছিল তোমাকে। তারপর যা ভয় করেছিলাম তাই হল। উঁচু আসনের যোগ্য তুমি ছিলে না। ওয়াল্টেয়ারে তুমি তার কাছে তিনদিনের বেশী চারদিন থাকতে পারলে না। তাকে ভালবাসার যোগ্যতা তোমার ছিল না। তুমি কেবলই তাকে দুঃখ দিলে। তোমার স্মৃতি তার বুকে বিঁধে রইল কাঁটার মত! তুমি তাকে ফেলে চলে এলে কলকাতায়। কলকাতা ছাড়া তোমার মত মেয়ের চলতে পারে না। তুমি চলে আসার পর সে আমাকে ওয়াল্টেয়ার থেকে একখানা চিঠি লেখে। সে চিঠি আমি তোমার কাছে পাঠিয়েছিলাম। আমি জানি, তুমি তার মর্ম বুঝতে পার নি। তারপর ছ'মাস পরে আজ সকালে আবার তার সঙ্গে দেখা হল। দেখলাম, কি গভীর দুঃখ, কত ভালবাসা, কত ব্যথা

রয়েছে তার মনে। তুমি তার কোন আঁচ পাও নি। পাবে কি করে? তুমি তো তাকে ভালবাস না। তুমি ভালবাস নিজেকে, নিজের লজ্জাকে, নিজের পাপকে। নিজের আত্মাকে নিগৃহীত মনে করে তোমার আনন্দ হয়—সেই হীন আনন্দটুকু পাবার জন্যে তুমি তার দেওয়া উঁচু আসন পায়ে ঠেলে চলে এলে। আমি জানি, এসব কথা বোঝার মত বুদ্ধি তোমার নেই, তাই তুমি বোকার মত হাসছ।

চিত্রা। (গম্ভীরভাবে) তুমি দেখতে বোধ হয় ভুল করেছ
সুমিত্রা। তোমার কথার মধ্যে আমি তো একবারও হাসি নি।

সুমিত্রা। (উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে) তোমার যত খুশি হাসতে পার—আমার যা বলবার আছে আমি তা বলব। তার মত সরল, তার মত মহৎ পৃথিবীতে আর একটিও আছে বলে আমি বিশ্বাস করি না। যে যত বড় অপরাধই করুক না কেন, তার কাছ থেকে ক্ষমা সে পাবেই। তাই সে তোমাকে ক্ষমা করেছে—তোমাকে সে ভালবাসে না। তোমার জন্যে তার বড় দুঃখ, এইটুকু, আর কিছু নয়, আর কিছু নয়! (এক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া) আশা করি, আমি যা জানতে চাই, তা তুমি পরিষ্কার বুঝতে পেরেছ?

চিত্রা। বুঝতে হয়ত পেরেছি—তবু তোমার মুখ থেকেই শুনতে চাই।

সুমিত্রা। (ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়া) আমি জানতে চাই কোন অধিকারে তুমি আমার আর ওর মাঝে এসে দাঁড়িয়েছে? তাকে ঐ ভাবে অপমান করে ছেড়ে চলে আসার পর বার বার জানাতে চেষ্টা করেছ, তুমি তাকে এখনও ভালবাস—কেন?

চিত্রা। আমি কোনদিন তোমার কাছে বলতে আসি নি, আমি তাকে ভালবাসি—

সুমিত্রা। তোমার প্রত্যেকটা চিঠি ঐ কথা বলছে! তুমি কি

মনে কর তোমার চিঠির মানে আমি বুঝতে পারি নি? তুমি জানাতে চেয়েছিলে কত বড় আত্মত্যাগ তুমি করছ! তবু যদি তাকে ভালবাসার ক্ষমতা তোমার থাকত, সে যোগ্যতা তোমার থাকত! শুনেছি তুমি অনেক লেখাপড়া শিখেছ—শুনেছি তোমার অবসর কাটে রবীন্দ্রনাথ, বোদেলিয়র আর স্নুইনবার্ণ পড়ে। কিন্তু শিক্ষা তোমায় কোন যোগ্যতা এনে দেয় নি—এনে দিয়েছে শুধু আত্ম-অহংকার! আনন্দবাবুর মত লোক তোমাকে বিয়ে করে সম্মানিত করতে চেয়েছিলেন। সে সম্মানের মর্যাদা তুমি রাখতে পার নি—তুমি অপদার্থ!

চিত্রা। (মৃদু হাসিয়া) আমার তো মনে হয় তোমাকেও ঠিক ঐ কথাটাই বলা চলে।

সুমিত্রা। (প্রায় চীৎকার করিয়া) তোমার স্পর্ধা তো কম নয় দেখছি। অপদার্থ তুমি নও? তাই যদি না হবে, তবে মহিমকে ছাড়বার আগে ওরকম কেলেঙ্কারি করেছিলে কেন?

চিত্রা। (তাহার মুখের ভাব সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া গেল। দৃষ্টিতে ফুটিয়া উঠিল ক্রোধ এবং ঘৃণা। কম্পিত কণ্ঠস্বরে) আমাকে তুমি কতটুকু জান, যে আজ আমার বিচার করতে এসেছ?

সুমিত্রা। অন্তত এটুকু জানি যে, মহিমকে ছেড়ে তুমি সৎভাবে জীবন যাপন করতে চেষ্টা পর্যন্ত কর নি—আনন্দবাবুর সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিলে! শুনেছি মহিম নাকি তোমার হাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে আত্মহত্যা করতে চেয়েছিল—এখন দেখছি কথাটা নেহাৎ মিথ্যে নাও হতে পারে।

চিত্রা। (ক্রুদ্ধ স্বরে) চুপ কর! আজ যদি আমার হাতে চাবুক থাকত তো তোমার কথার জবাব আমি দিতাম। তোমার মত নির্বোধের সঙ্গে তর্ক করা মিথ্যে। আমার চাকরানীটাও তোমার চেয়ে ভাল বোঝে।

সুমিত্রা। কিছু আশ্চর্য নয়! সে তোমার চেয়ে অনেক বড়, অনেক উঁচু। সে কাজ করে খায়—

চিত্রা। (ঘৃণা মিশ্রিত কণ্ঠস্বরে) কাজ কথাটার ওপর একটা শ্রদ্ধা ছিল। তোমার মুখে কাজের কথা শুনে, কাজের ওপর ঘেন্না ধরে গেল!

সুমিত্রা। (ব্যঙ্গ ও তাচ্ছিল্যপূর্ণ স্বরে) কাজ! কাজ কোনদিন করতে চেয়েছিলে? মহিমকে ছেড়ে দিয়ে আমার কাছে আস নি কেন? আমি তোমাকে আমার বাড়ির ঝি-এর কাজটা দিতাম।

রঞ্জন। (এতক্ষণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় দাঁড়াইয়া ছিল। এইবার আর্তস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল) এ তুমি অন্যায় করছ সুমিত্রা—চিত্রার ওপর তুমি অবিচার করছ। (এই কথা বলিতে বলিতে চিত্রা ও সুমিত্রার দিকে অগ্রসর হইয়া আসিল। আনন্দ যেখানে ছিল সেখানেই দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার মুখ গম্ভীর। দেখা গেল সে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া একদৃষ্টিতে এই দিকে চাহিয়া রহিয়াছে।)

চিত্রা। (রঞ্জনকে) এই অসভ্য মেয়েটাকে এর অভিভাবকেরা গভর্ণেস ছাড়া একা সমাজে ছেড়ে দেয় কি করে, বলতে পার রঞ্জন? (সুমিত্রাকে) আমাকে তুমি কেন ডেকে আনিয়েছ, জান? আমাকে তোমার দারুণ ভয়, সেই জন্যে—

সুমিত্রা। ভয়!—আমার!—তোমাকে?

চিত্রা। হ্যাঁ আমাকে! তুমি জানতে চাও রঞ্জন আমাকে তোমার চেয়ে বেশী ভালবাসে কিনা! you are fearfully jealous!

সুমিত্রা। (কণ্ঠস্বরে ফুটিয়া ওঠে অসীম ঘৃণা) রঞ্জন তোমাকে ভালবাসে! রঞ্জন তোমাকে ঘৃণা করে বুঝলে—রঞ্জন তোমাকে রীতিমত ঘৃণা করে।

চিত্রা। (কণ্ঠস্বরে প্রকাশ পাইতেছিল দারুণ আবেগ ও উত্তেজনা) আমি জানি তুমি মিথ্যে কথা বলছ। আমি প্রমাণ করে দিতে পারি। জান—আমার মুখের একটিমাত্র কথায় সে তোমাকে জন্মের মত ছেড়ে দিতে পারে। বলব—বলব আমি তাকে? দূর করে তাড়িয়ে দেব আনন্দকে। মনে করিয়ে দেব রঞ্জনকে তার ওয়ান্টেয়ারের সেই কথা। (রঞ্জনকে) মনে পড়ে রঞ্জন? তুমি আমাকে বলেছিলে—"চিত্রা, তোমরে দুঃখ রয়েছে আমার মনে—সেখানে তোমার আসন চিরকালের। যখনি তুমি চাইবে, তখনি আমাকে তুমি পাবে তোমার পাশে।"—(অশ্রু জড়িত কণ্ঠস্বরে) মনে পড়ে রঞ্জন সে কথা? তবে আজ আমার পাশে এসে দাঁড়াও বন্ধু। তোমাকে পাশে পাওয়ায় গৌরব আমাকে রক্ষা করুক এই ধিক্কার থেকে, গ্লানি থেকে, এই অপমান থেকে।

সুমিত্রা। (চোখ তাহার জ্বলিতেছে) তুমি যদি ওর পাশে গিয়ে দাঁড়াও রঞ্জন, তবে জেনে রাখ, আমার সঙ্গে তোমার সম্পর্কের এই শেষ।

(রঞ্জন অভিভুতের ন্যায় চিত্রার দিকে অগ্রসর হইতেছিল। সুমিত্রার কথা শুনিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল)

রঞ্জন। (সুমিত্রার নিকট গিয়া, আর্তস্বরে) তুমি ভুল করেছ সুমিত্রা। চিত্রার প্রতি তুমি অবিচার করেছ।

চিত্রা। (দ্রুত রঞ্জনের নিকট আসিয়া তাহাকে বাহুপাশে আবদ্ধ করিল। তাহার দুই চক্ষু দিয়া তখন অবিরল ধারায় অশ্রু ঝরিতেছে।) আমাকে ছেড়ে তুমি চলে যাচ্ছ রঞ্জন। (প্রবল আবেগে তাহার সর্বাঙ্গ কম্পিত হইতেছিল। রঞ্জন বিদ্যুৎস্পৃষ্টের ন্যায় চিত্রার দিকে ফিরিল। দেখিল চিত্রার মূর্ছিতপ্রায় অবস্থা। তাহাকে না ধরিলে সে বোধহয় ঐ স্থানেই মূর্ছা যাইত।)

রঞ্জন। (চিত্রাকে ধরিয়া, আবেগ কম্পিত স্বরে) তাই কি আমি পারি চিত্রা, তোমাকে ছেড়ে দিতে। তোমার ভয় আমাকে ভীত করে তুলেছে, তোমার বেদনা আমাকে ব্যথিত করেছে—আমি তোমার চিত্রা—আমি তোমারই। (কি এক অপূর্ব উল্লাসে চিত্রার মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল! কোথায় গেল তাহার মূর্ছিতপ্রায় অবস্থা।)

চিত্রা। (উন্মাদের ন্যায় চীৎকার করিয়া) দেখলে সুমিত্রা—রঞ্জন আর কারও নয়, সে শুধু আমারই। (দুই হাত দিয়া রঞ্জনের মুখ আলোর দিকে তুলিয়া ধরিল) রঞ্জু আমার, বন্ধু আমার প্রিয় আমার। আনন্দ, তোমার সঙ্গে এই আমার শেষ দেখা। আমি আর কারও নই—রঞ্জনের। (আনন্দ ধীর পদক্ষেপে চিত্রার নিকট আসিয়া চিত্রাকে স্পর্শ করিল।)

আনন্দ। (মৃদু স্বরে) কিন্তু চিত্রা, তোমার পাথরের ঠাকুর যে অপবিত্র হয়ে যাবে। তুমি তো তা সহ্য করতে পারবে না। (তড়িতাহতের ন্যায় চিত্রা রঞ্জনের নিকট হইতে সরিয়া আসিয়া আনন্দর বুকের মধ্যে মুখ লুকাইল।)

চিত্রা। (অশ্রুজড়িত স্বরে) ঠিক বলেছ আনন্দ, আমার পাথরের ঠাকুর অপবিত্র হয়ে যাবে—এ তো আমি সহ্য করতে পারব না।

আনন্দ। তাই তো আজ রাতে তোমার আমার মহামিলন। আজ যে আমি তোমাকে চিরকালের মত আমার করে নেব।

চিত্রা। পারবে আনন্দ? চিরকালের মত আমাকে তোমার করে নিতে পারবে?

আনন্দ। (শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠস্বরে) কেন পারব না চিত্রা—নিশ্চয় পারব।

চিত্রা। (ব্যাকুল স্বরে) তবে আমাকে এখান থেকে নিয়ে চল

আনন্দ। তুমি যে আমার অন্ধকারের বন্ধু—আলোর হাত থেকে আমাকে উদ্ধার করে নিয়ে চল আনন্দ।

আনন্দ। চল চিত্রা, (চিত্রার কম্পিত দেহ নিজের দুই বাহুর উপর তুলিয়া লইল। বাগানের দরজা পর্যন্ত গিয়া মুখ ফিরাইয়া) আপনার আর ভয় নেই সুমিত্রা দেবী, চিত্রা আর কোনদিন আপনাদের মাঝে আসবে না। চিত্রাকে এবার আমি নিজের করে নেব। (দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেল। আলোর দেখা গেল রঞ্জন নির্বাক। সুমিত্রা এক দৃষ্টিতে রঞ্জনের দিকে তাকাইয়া রহিয়াছে। সে দৃষ্টি ক্রোধে, উত্তেজনায়, অপমানে কঠিন হইয়া উঠিয়াছে।)

রঞ্জন। (অল্পক্ষণ নীরবে অতিবাহিত হইবার পর) আনন্দ যাবার সময় কি যেন বলে গেল সুমিত্রা ?

সুমিত্রা। (কঠিন স্বরে) কি জানি—আমার মনে নেই। (এক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া) আমার একটা প্রশ্নের জবাব দেবে রঞ্জন ?

রঞ্জন। নিশ্চয় দেব, সুমিত্রা—

সুমিত্রা। চিত্রার সামনে আমাকে ওভাবে অপমান করলে কেন ?

রঞ্জন। অপমান তো আমি তোমাকে করি নি সুমিত্রা—আমি তোমাকে অপমানের হাত থেকে বাঁচিয়েছি।

সুমিত্রা। আমার চোখে তুমি বড় ছোট হয়ে গেছ রঞ্জন—মিথ্যে কথা বলে নিজেকে আর ছোট করো না।

রঞ্জন। মিথ্যে আমি একটুও বলি নি সুমিত্রা! চিত্রাকে অপমান করে তুমি নিজেকেই অপমান করেছ! তুমি ক্রমশ উত্তেজিত হয়ে উঠছিলে। তোমার বিবেক তোমাকে বাঁধা দিচ্ছিল, চিত্রাকে অপমান করতে। তুমি তাকে জোর করে চেপে রাখবার চেষ্টা করছিলে। তাই না তোমার অপমান অত তীব্র হয়ে উঠেছিল। চিত্রার দুঃখ তুমিও বুঝেছিলে সুমিত্রা। কিন্তু তা প্রকাশ করতে তোমার লজ্জা

হচ্ছিল। তাই তো তুমি চিত্রাকে অপমান করে, নিজেকে অপমান করলে। কেন করলে সুমিত্রা ?

সুমিত্রা। (ক্রোধে তাহার দুই চক্ষু জ্বলিতেছে) তুমি মিথ্যে সান্ত্বনা দিচ্ছ নিজেকে। চিত্রা সম্বন্ধে আমার সত্যি ধারণা কি শুনবে ?

রঞ্জন (সুমিত্রার নিকট আসিয়া, তাহার দুই হাত নিজের হাতের মধ্যে লইয়া) চুপ কর সুমিত্রা—আমি আর সহ্য করতে পারছি না। কেন তুমি নিজেকে ঠকাতে চেষ্টা করছ ? এতে তোমার দুঃখ বাড়বে বই কমবে না সুমিত্রা।

সুমিত্রা। (হাত ছাড়াইয়া লইয়া, উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে) তুমি নিজেকে ঠকাতে চেষ্টা করছ রঞ্জন, আমি নয়। কে বললে, দুঃখ আমার এতে বাড়বে ? এতটুকুও নয়। এই দেখ আমি হাসছি রঞ্জন, হাসতে হাসতে বলছি তোমাকে, চিত্রা কি ধরণের মেয়ে। (অস্বাভাবিক স্বরে হাসিতে হাসিতে) আমার ধারণা চিত্রার মত ঘৃণ্য, জঘন্য চরিত্রের মেয়ে পৃথিবীতে আর দুটি নেই। তাকে ভালবাসা পাপ, তাকে সহানুভূতি জানান পাপ, তার জন্যে দুঃখ বোধ করা পাপ। সে পাপকে প্রশ্রয় দিচ্ছ তুমি রঞ্জন, আর তোমার মত নির্বোধেরা— (বলিতে বলিতে তাহার অস্বাভাবিক হাসি থামিয়া গেল। সেডের থাম ধরিয়া আকুল ক্রন্দনে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।)

রঞ্জন। (মৃদু স্বরে) আমি জানি, তুমি জোর করে মিথ্যে কথা বলছ সুমিত্রা।

সুমিত্রা। (অশ্রু-জড়িত স্বরে) তুমি জান ? কি করে জানলে ? তোমার মত নির্বোধের কিছু জানবার ক্ষমতা আছে ?

রঞ্জন। জানব না আমি! আমি যে তোমাকে ভালবাসি সুমিত্রা।

সুমিত্রা। (ততক্ষণে নিজেকে সে আয়ত্তের মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছে। রঞ্জনকে অপমান করিবার ইচ্ছা তাহার মধ্যে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে।) কি বললে ? আমাকে তুমি ভালবাস ! ভালবাসা কথার মানে বোঝ রঞ্জন ? (এমন সময় ভিতরের দরজা দিয়া মিস্টার ও মিসেস রায় প্রবেশ করিলেন। রায়কে) বাবা, তুমি আজ রাত্তিরের মধ্যে উত্তর চেয়েছিলে না ? সব ঠিক হয়ে গেছে। জান না তুমি ? রঞ্জন যে আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছে। চাও নি রঞ্জন ?

রঞ্জন। (শান্ত গম্ভীর স্বরে) না সুমিত্রা, তুমি বোধহয় ভুল শুনেছ। তোমাকে পাব এ আশা আমার নেই, কোনদিন ছিল না। তবে তোমাকে আমি ভালবাসি সুমিত্রা—শুধু তারই জোরে যদি কোনদিন তোমাকে পাই, তবে আপ্রাণ চেষ্টা করব তোমাকে সুখী করতে।

সুমিত্রা। (উত্তেজিত স্বরে) কই বাবা। তোমরা রঞ্জনকে জিজ্ঞেস কর—কত টাকার সম্পত্তি আছে ওর—কি দিয়ে সুখী করবে ও আমাকে !

রায়। (ভর্ৎসনার সুরে) ছিঃ সুমিত্রা, রঞ্জনের সঙ্গে তুমি এ ভাবে ঠাট্টা করবে তা আমি আশা করতে পারি নি।

মিসেস রায়। (ক্রুদ্ধস্বরে) এখন আর "ছিঃ সুমিত্রা" করলে কি হবে। আস্কারা দিয়ে দিয়ে তুমিই তো ওকে একেবারে ধিঙ্গী করে তুলেছ।

রায়। (ব্যস্ত হইয়া) না না, রঞ্জন, তুমি ওর কথা যেন সত্যি বলে মনে করো না ?

সুমিত্রা। (অস্বাভাবিক ভাবে হাসিয়া) বাঃ—কেন সত্যি বলে মনে করবে না ? পাত্র হিসেবে ও কি কিছু খারাপ নাকি। তোমরা যদি কিছু না জিজ্ঞেস কর, আমিই জিজ্ঞেস করছি—

মিসেস রায়। (তীব্র ভর্ৎসনার সুরে) সুমিত্রা !

সুমিত্রা। (মিসেস রায়ের আহ্বান গ্রাহ্য না করিয়া) কত টাকার সম্পত্তি আছে তোমার রঞ্জন?

রঞ্জন। আমার নিজের তো বিশেষ কিছুই নেই সুমিত্রা।

রায়। সে কি! কীর্তিনাথের সম্পত্তি?

রঞ্জন। সে সম্পত্তির সামান্যই আমি নিজের জন্যে রাখব ঠিক করেছি!

মিসেস রায়। আর বাকী?

রঞ্জন। কিছু পাবেন যতীনের মা, কিছু যাবে ডক্টর আলির এশাইলামে—আর বাকীটা দিয়ে একটা হস্‌পিটাল খুলে দেবে ঠিক করেছি।

রায়। কিন্তু কীর্তিনাথের উইলে কি কিছু mention করা ছিল?

রঞ্জন। না, আমার মনে হয় সময়ের অভাবে তিনি mention করে যেতে পারেন নি।

মিসেস রায়। কিন্তু কি করে জানলে তাঁর ঐ ইচ্ছেই ছিল?

রঞ্জন। তা নইলে তিনি আমার মত লোকের হাতে সম্পত্তি দিয়ে যাবেন কেন? তিনি জানতেন, আমি একটা দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগেছি, রোগযন্ত্রণা কি তা আমি বুঝি। তিনি নিশ্চয় চেয়েছিলেন তাঁর অর্থ মানুষের রোগযন্ত্রনা দূর করতে সাহায্য করুক।

(এতক্ষণ সুমিত্রা এক দৃষ্টিতে রঞ্জনের মুখের দিকে তাকাইয়াছিল। তাহাকে দেখিয়া মনে হইতেছিল, রঞ্জনকে অপমান করিবার ইচ্ছা পুনরায় তাহার মধ্যে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে।)

রায়। কিন্তু—

সুমিত্রা। (রায়কে কথা শেষ করিতে না দিয়া ব্যঙ্গ ও তাচ্ছিল্যের স্বরে) কিন্তু তাহলে তুমি আমার ভরণ-পোষণ করবে কি দিয়ে রঞ্জন?

রঞ্জন। (উৎসাহিত হইয়া) সে আমি ঠিক করে রেখেছি। আমার নিজের জন্যে একখানা গাড়ী কিনে ড্রাইভিং শিখব। তারপর দিনে ট্যাক্সি চালাব—যা পাব তা দিয়ে আমাদের দুজনের বেশ ভালই চলে যাবে। নিজের একখানা গাড়ীও হবে—অবসর সময়ে কত জায়গায় যেতে পারব, কত লোকের সঙ্গে আলাপ হবে, কত লোককে ভালবাসতে পারব, কত লোককে নিজের করে নেব। (রঞ্জনের কি যেন মনে পড়িয়া গেল। অস্ফুট স্বরে বলিয়া চলিল)—নিজের করে নেব—নিজের করে নেব।

সুমিত্রা। (উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে) কত বড় ambition দেখেছ বাবা! Taxi driver হতে চায়! And that idiot wants to marry me! হাঃ হাঃ হাঃ—(অদ্ভুত অস্বাভাবিক সে হাসি—মনে হইল সুমিত্রা বোধহয় পাগল হইয়া যাইবে।)

মিস্টার ও মিসেস রায়। (একসঙ্গে, শঙ্কিত কণ্ঠস্বরে) সুমিত্রা! সুমিত্রা! (সুমিত্রাকে মিসেস রায় ধরিয়া ফেলিলেন। সুমিত্রা কিন্তু হাসিয়াই চলিল।)

রঞ্জন। (প্রায় চীৎকার করিয়া) মনে পড়েছে সুমিত্রা—আনন্দ যাবার সময় বলে গেল, চিত্রাকে সে চিরকালের মত নিজের করে নেবে! (তাহার চোখে মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে দারুণ ভীতির ভাব) চিরকালের মত! এ কথার মানে কি বলতে পার সুমিত্রা? না না, এ হতে পারে না! এত দুঃখ চিত্রা পেতে পারে না! আমি যাচ্ছি চিত্রা!—চিত্রা, আমি যাচ্ছি—চিত্রা—(চীৎকার করিয়া ডাকিতে ডাকিতে বাহির হইয়া গেল)

সুমিত্রা। (পূর্ববৎ হাসিতে হাসিতে) জাহান্নমে যাক্ চিত্রা! He wants to be Taxi driver—idiot! (হঠাৎ রঞ্জনের 'চিত্রা' ডাক কানে আসিতে সচেতন হইয়া উঠিল। রঞ্জন ততক্ষণে

বাহির হইয়া গিয়াছে—দূর হইতে ভাসিয়া আসিতেছে তাহার আকুল কণ্ঠস্বর—'চিত্রা' আমি যাচ্ছি—চিত্রা—)

সুমিত্রা। (দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া, ভীতপূর্ণ স্বরে) রঞ্জনকে ফেরাও বাবা! আনন্দ যাবার সময় বলে গেছে—চিত্রাকে সে নিজের করে নেবে! ও যদি গিয়ে দেখে চিত্রা···না না, বাবা—রঞ্জন তাহলে পাগল হয়ে যাবে! তুমি আমাকে সেখানে নিয়ে চল বাবা—আমাকে সেখানে নিয়ে চল!—(বলিতে বলিতে আকুল ক্রন্দনে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।)

রায়। (শঙ্কিত কণ্ঠস্বরে) কোথায় নিয়ে যাব রে? রঞ্জন কোথায় গেল?

সুমিত্রা। (অশ্রুজড়িত কণ্ঠস্বরে) যেখানে চিত্রা আর আনন্দ আছে! তুমি শিগ্‌গির চল বাবা, নইলে রঞ্জন পাগল হয়ে যাবে—

মিসেস রায়। (সুমিত্রাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া) আমি তোকে নিয়ে যাব সেখানে—নিশ্চয় নিয়ে যাব—তুই একটু ঠাণ্ডা হ মা!—(রায়কে) শুনছ—তুমি একটু খোঁজ নাও তো ওরা কোথায় গেছে—(সুমিত্রাকে) তুই একটু ঠাণ্ডা হ মা—আমি কথা দিচ্ছি তোকে আমি নিয়ে যাব! (রায়—"আমি এখনি যাচ্ছি" এই বলিয়া বাগানের দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেলেন। সুমিত্রা মিসেস রায়ের বুকে মুখ লুকাইয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল।)

[পর্দাও এইসঙ্গে নামিয়া আসিল।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

(আনন্দর বাড়ির দোতলায় একটি শয়ন-কক্ষ। ঘরটি বেশ লম্বা। আসবাব-পত্র বিশেষ কিছুই নাই। একপাশে একটি খাট। খাটের উপর শয্যা বিছান—সূক্ষ্ম নেটের মশারি ফেলা। ঘর অন্ধকার

পিছনদিকের দুইটি জানালাই বন্ধ। রাত্রি গভীর। দুইজন লোক মৃদুস্বরে কথা কহিতেছে—একজন আনন্দ, আর একজন রঞ্জন!)

আনন্দ। (শান্ত কণ্ঠস্বরে) এত দেরী করে এলে রঞ্জন! আমি যে তোমার পথ চেয়ে বসে আছি—

রঞ্জন। আমি অনেকক্ষণ এসেছি ভাই! তোমার দারোয়ান উঠতে দেয় নি—তাকে নাকি তোমার বারণ করা আছে—

আনন্দ। হ্যাঁ তাকে বারণ করে দিয়েছিলাম। কিন্তু তোমার কথা তো তাকে বলে এসেছি!

রঞ্জন। তাহলে বোধ হয় সে ভুল করেছে।—(উৎকণ্ঠিত স্বরে) চিত্রা কোথায় আনন্দ?

আনন্দ। চিত্রা এখানেই আছে রঞ্জন—এই ঘরে—

রঞ্জন। কোথায়? বড় অন্ধকার—আলোটা জ্বেলে দেবে আনন্দ?

আনন্দ। (ব্যস্ত হইয়া) না না, আলো জ্বালা চলবে না! চোখে আলো পড়লে চিত্রার ঘুম ভেঙ্গে যাবে যে! তার চেয়ে বরং এই জানালাটা খুলে দিই—(জানালা খুলিয়া দিতেই পূর্ণিমার চাঁদের আলো ঘরে আসিয়া পড়িল।)—আজ রাতটা এখানেই থাকবে তো রঞ্জন? (নিকটে আসিয়া রঞ্জনের কাঁধে হাত রাখিতেই বুঝিতে পারিল রঞ্জনের সর্বাঙ্গ কম্পিত হইতেছে) একি রঞ্জন—তুমি কাঁপছ! ভয় নেই—কোন ভয় নেই—সব ভয়ের আজ শেষ হয়ে গেছে!

রঞ্জন। (উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে) আনন্দ! চিত্রা কোথায়? চিত্রা! কই উত্তর পাচ্ছি না তো?

আনন্দ। বললুম না, চিত্রা ঘুমুচ্ছে ঐ খাটে—ঐ যে মশারি ফেলা আছে! শুনতে পাবে কি করে তোমার ডাক! এস, দেখবে এস—(রঞ্জনকে লইয়া খাটের নিকট গেল) দেখ রঞ্জন—মশারি তুলে দেখ—চিত্রাকে দেখতে পাবে—

(রঞ্জন মশারি তুলিয়া দেখিল। কয়েক মুহূর্তের জন্য তাহার দৃষ্টি নিবদ্ধ রহিল শয্যায় শায়িত চিত্রার মুখের উপর। তাহার পর মশারি নামাইয়া দিয়া আনন্দর নিকট ফিরিয়া আসিল।)

রঞ্জন। (মৃদু অথচ আবেগকম্পিত কণ্ঠস্বরে) কেন করলে আনন্দ, এ কাজ ?

আনন্দ। চিত্রাকে চিরকালের জন্যে নিজের করে নিয়েছি রঞ্জন ! আর সে বার বার আমাকে ছেড়ে তোমার কাছে পালিয়ে যেতে পারবে না ! জান রঞ্জন, আজ আমার সমস্ত জ্বালা জুড়িয়ে গেছে ! চিত্রা রয়েছে আমার বুকের ভেতর—এইখানে ! আর আমি তোমাকে ভয় করি না রঞ্জন—তাইতো তোমাকে আজ এখানে থাকতে বললাম—থাকবে তো রঞ্জন ?

রঞ্জন। নিশ্চয় থাকব ! থাকব না ? তুমি আর আমি দুজনে একসঙ্গে চিত্রাকে পাহারা দেব—

আনন্দ। ঠিক বলেছ—আমরা দুজনে মিলে চিত্রাকে পাহারা দেব ! কেউ এসে চিত্রাকে আমাদের কাছ থেকে নিয়ে যেতে পারবে না—

রঞ্জন। কেউ না—কখনও না—

আনন্দ। একটা গন্ধ পাচ্ছ না রঞ্জন ?

রঞ্জন। গন্ধ ? বোধ হয় পাচ্ছি ! না, পাচ্ছি না তো ? (উৎসাহিত হইয়া) তবে সকালবেলা নিশ্চয় পাব !

আনন্দ। ভোরবেলা আমি গিয়ে ফুল কিনে আনব রঞ্জন—

রঞ্জন। তাই এন আনন্দ ! রাশি রাশি ফুল—কত ফুল—কত মালা !

আনন্দ। আমরা নিজের হাতে ওকে সাজিয়ে দেব রঞ্জন ! মনে বড় কষ্ট হবে সাজাবার সময়—না রঞ্জন ?

রঞ্জন। বড় কষ্ট হবে আনন্দ—বড় কষ্ট! হ্যাঁ, ভাল কথা, যে ছুরিটা আমি দেখেছিলাম, সেইটে দিয়েই তো?

আনন্দ। হ্যাঁ সেই ছুরিটা! ওটা সকাল থেকেই আমার কাছে ছিল। কেন জানি না, আজ ভোরবেলা ওটাকে ড্রয়ার থেকে বার করে নিয়েছিলাম—

রঞ্জন। খুব বেশী রক্ত বেরিয়েছিল আনন্দ?

আনন্দ। আশ্চর্য রঞ্জন! রক্ত তো বেশী বেরয় নি—অল্প, সামান্য রক্ত! বিঁধিয়েছিলাম বাঁ দিকের বুকে—অনেকটা বিঁধিয়ে দিয়েছিলাম! কিন্তু রক্ত বেশী বেরোয় নি তো—

রঞ্জন। একেবারে ফুসফুসে গিয়ে বিঁধেছে—তাই রক্ত বেশী বেরোয় নি আনন্দ!

আনন্দ। (মুখে আঙ্গুল দিয়া) চুপ। কারা যেন আসছে না?

রঞ্জন। চুপ! সত্যিই তো পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে!

(নীচে হইতে দরোয়ানের কণ্ঠস্বর শোনা গেল—"যাবেন না বাবু—বাবুর বারণ আছে"—তাহা সত্ত্বেও পায়ের শব্দ উপরে উঠিতে লাগিল।)

আনন্দ। দরজায় খিল দিয়ে দেব রঞ্জন?

রঞ্জন। না না, ভেজানই থাক—তাহলেই ওরা ফিরে যাবে! খিল দিতে গেলে যদি জোরে শব্দ হয়? চিত্রার ঘুম ভেঙ্গে যাবে যে!

(দরজা ঠেলিয়া সুমিত্রার প্রবেশ, পিছনে মিস্টার ও মিসেস রায়।)

সুমিত্রা। (রঞ্জনের নিকট আসিয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠস্বরে) তোমার কথাই ঠিক রঞ্জন—আমার ভুল আমি বুঝতে পেরেছি।

রঞ্জন। (হাসিয়া, আনন্দকে) ভুল? কিসের ভুল? কার ভুল?

আনন্দ। সত্যিই তো! কিসের ভুল? ভুল তো আমরা করি নি! এরা কারা?

রঞ্জন। এরা? এরা বোধ হয় চিত্রার বন্ধু—চিত্রাকে দেখতে এসেছে।—তা যাক না—চিত্রা ওই খাটে শুয়ে আছে। দেখ—যেন শব্দ করো না—চিত্রার ঘুম ভেঙ্গে যাবে!

(সুমিত্রা সেইখানেই দাঁড়াইয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিতে লাগিল। মিস্টার ও মিসেস রায় শয্যার নিকট গিয়া মশারি তুলিয়া দেখিলেন। বেশীক্ষণ দেখিতে হইল না, সমস্তই বুঝিতে পারিলেন। ধীরপদে রঞ্জনের নিকট ফিরিয়া আসিলেন।)

মিসেস রায়। (অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠস্বরে) চল বাবা রঞ্জন—আমরা এখান থেকে যাই!

রঞ্জন। যাব? কোথায়? কি করে যাব? কত কাজ আমাদের! তাই না আনন্দ?

আনন্দ। নিশ্চয়! কত কাজ এখন আমাদের! আমাদের কি যাওয়া চলে!

রায়। (রঞ্জনের পিঠে হাত রাখিয়া) এখানে থাকা আর ঠিক হবে না রঞ্জন। পুলিশ আসবে—গোলমাল হবে···

রঞ্জন। (রায়ের নিকট হইতে সরিয়া আসিয়া) এরা কারা আনন্দ? এরা তো চিত্রার বন্ধু নয়! কিছুতেই শুনবে না কথা! বলছি না—কত কাজ আমাদের! চিত্রাকে সাজাতে হবে ফুল দিয়ে, মালা দিয়ে,—(হঠাৎ সুমিত্রার দিকে দৃষ্টি পড়িতে)—তুমি কে? এখানে দাঁড়িয়ে কাঁদছ কেন? কিছু হয় নি তো চিত্রার—চিত্রা যে ঘুমুচ্ছে—(তথাপি সুমিত্রাকে কাঁদিতে দেখিয়া, আর্তস্বরে) আঃ! কান্না থামাও না গো—চিত্রা যে মোটে কান্না সইতে পারে না—

সুমিত্রা। (অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠস্বরে) আমাকে তুমি চিনতে পারছ না রঞ্জন! ভাল করে চেয়ে দেখ, আমি সুমিত্রা!

(ততক্ষণে রায় সুইচ খুঁজিয়া পাইয়া ঘরের আলো জ্বালিয়া দিয়াছেন।

আলো চোখে লাগিতে আনন্দ দুই হাতে চোখ ঢাকিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িল।)

রঞ্জন। (সুমিত্রার কথায় হঠাৎ একটু সচেতন হইয়া সুমিত্রার মুখের দিকে কি যেন দেখিল) সুমিত্রা? না, তুমি তো সুমিত্রা নও! সুমিত্রা যে হারিয়ে গেছে—অনেক দিন হ'ল! সেই কবে একবার তার দেখা পেয়েছিলাম—হঠাৎ একদিন সন্ধেবেলায়! কোথায় জান?

সুমিত্রা। জানি রঞ্জন—ওয়াল্টেয়ারে—

রঞ্জন। না গো না, ওয়াল্টেয়ারে নয়! (মুখে ফুটিয়া উঠিল শিশু-সুলভ হাসি) তুমি কিচ্ছু জান না—ওয়াল্টেয়ারে কেন হতে যাবে? শিপ্রা নদীর ধারে, উজ্জয়িনীতে! সে আমার এখনও মনে আছে—

অঙ্গের কুম্‌কুম গন্ধ কেশধূপবাস
ফেলিল সর্বাঙ্গে মোর উতলা নিশ্বাস।
প্রকাশিল অর্ধচ্যুত বসন-অন্তরে
চন্দনের পত্রলেখা বাম পয়োধরে।
দাঁড়াইল প্রতিমার প্রায়
নগরগুঞ্জনক্ষান্ত নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়॥

সুমিত্রা। (ব্যাকুল স্বরে) রঞ্জন, ভাল করে চেয়ে দেখ, আমি সুমিত্রা!—রঞ্জন—

রঞ্জন। না না, তুমি নও! সেদিন সন্ধ্যায় আমার সঙ্গে তার যে মিলন হয়েছিল। আমি যে তাকে চিনি। আমার পরিষ্কার মনে আছে তার মুখ—

মুখ খানি তার
নতবৃন্ত-পদ্ম সম এ বক্ষে আমার
নমিয়া পড়িল ধীরে। ব্যাকুল উদাস
নিঃশব্দে মিলিল আসি নিশ্বাসে নিশ্বাস॥

সুমিত্রা। (উদ্‌গত অশ্রুর বেগ আর বোধ হয় বাধা মানিতে ছিল না)—রঞ্জন—রঞ্জন—

রঞ্জন। (আর্তস্বরে) না না, তুমি নও। সে আমার স্বপ্নের সুমিত্রা—কোথায় মিলিয়ে গেল—সন্ধ্যা গেল—রাত হল গভীর—

রজনীর অন্ধকার
উজ্জয়িনী করে দিল লুপ্ত একাকার।
দীপ দ্বার পাশে
কখন নিবিয়া গেল দুরন্ত বাতাসে।

ওঃ বড় অন্ধকার—একটুও আলো নেই! (হঠাৎ খোলা জানালা দিয়া চাঁদের দিকে দৃষ্টি পড়িতে উল্লসিত স্বরে) কে বললে আলো নেই! (আনন্দকে ঝাঁকানি দিতে দিতে)—দেখ আনন্দ—কত বড় থালার মত আলো! (সুমিত্রাকে) হ্যাঁ গো শুনছ, ঐ আলোটা আমায় পেড়ে দেবে—কত বড় থালার মতো আলো! (রঞ্জনের মুখে ফুটিয়া উঠিল বিচিত্র অদ্ভুত এক মৃদু হাসির রেখা। শিশুর ন্যায় আগ্রহভরে সে চাঁদের দিকে হাত বাড়াইয়া দিল। সুমিত্রা তখন উচ্ছ্বসিত হইয়া ক্রন্দন করিতেছে। মিসেস রায় আসিয়া সুমিত্রাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইলেন। সুমিত্রা মিসেস রায়ের বুকে মুখ লুকাইয়া ক্রন্দনে আকুল হইয়া উঠিল। রায় বিমূঢ়ের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। আনন্দের অবস্থা পূর্ববৎ।

পর্দা নামিয়া আসিল।

যবনিকা

সেদিন বঙ্গলক্ষ্মী ব্যাঙ্কে

আন্তন চেখভ অনুসরণে

বহুরূপী অভিনীত

প্রথম অভিনয় ৮ই নভেম্বর ১৯৫৪

চরিত্র-লিপি

সমরেশ চৌধুরী—বঙ্গলক্ষ্মী ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান।

অক্ষয়বাবু—সমরেশ চৌধুরীর প্রাইভেট সেক্রেটারী।

অনিলা দেবী—সমরেশ চৌধুরীর স্ত্রী।

কাদম্বিনী গাঙ্গুলী।

আর আছেন—পরিচালকমণ্ডলীর সদস্যগণ।

স্থান—বঙ্গলক্ষ্মী ব্যাঙ্কের বোর্ড অব ডিরেক্টরের চেয়ারম্যানের আপিস ঘর।

কাল—বর্তমান

প্রথম অভিনয় রজনীর ভূমিকা-লিপি

সমরেশ চৌধুরী	অমর গাঙ্গুলী।
অক্ষয়	জ্যাকেরিয়া।
অনিলা	তৃপ্তি মিত্র।
কাদম্বিনী	আরতি মৈত্র।
সদস্যগণ	শোভেন মজুমদার, কুমার রায়, নির্মল চট্টোপাধ্যায়।

নাট্য পরিচালক—শম্ভু মিত্র।

সেদিন বঙ্গলক্ষ্মী ব্যাঙ্কে

(বঙ্গলক্ষ্মী ব্যাঙ্কের বোর্ড অফ ডিরেক্টরের চেয়ারম্যানের আপিস ঘর। আপিস ঘরের উপযুক্ত আস্‌বাব। বাঁদিকে দরজা। দরজার ওধারে ব্যাঙ্কের আপিস ঘর। সময় বেলা একটা। চেয়ারম্যানের প্রাইভেট সেক্রেটারী অক্ষয়বাবু তাঁহার টেবিলে বসিয়া একা কাজ করিতেছেন। টেবিলের উপর কিছু কাগজ-পত্র, টাইপরাইটার ও একটি টোটালাইজার।)

অক্ষয়। (দরজার নিকট আসিয়া) এই ভোলা সামনের ডাক্তারখানা থেকে দুটো সারিডন ট্যাবলেট নিয়ে আয়। আর শোন—তোকে আমি অন্তত দুশোবার বলেছি এ ঘরের কুঁজোটা ভরে রাখতে—ভরিস নি কেন? হোপলেস্ কোথাকার! (টেবিলের নিকট আসিয়া) নাঃ আর পারছি না! আজ নিয়ে তিন দিন! সারা দিন এখানে টাইপ করা, রিপোর্ট তৈরি করা, আর রাত্তিরে বাড়িতে গিয়ে ফাইল মেলানো! (কাশিয়া) আবার বোঝার ওপর শাকের আঁটি—বেশ একটু জ্বরও হয়েছে, শীতও করছে—গা তো বেশ গরম!—হাত-পাও কামড়াচ্ছে! আর মাথা—মাথায় একি হল রে বাবা! যে দিকে তাকাই সে দিকেই দেখি সাইন্ অফ্ এক্স্‌ক্লামেশন্—রিপোর্টের সমস্ত এক্স্‌ক্লামেশনগুলো ঘোরা-ফেরা করছে! (চেয়ারে বসিয়া) চেয়ারম্যান! চেয়ারম্যান্ না কচু! একটা ভাঁড়, একটা হতচ্ছাড়া—উঃ অ্যানুয়াল রিপোর্ট পড়বেন! আবার রিপোর্টের টাইটেল দেওয়া হয়েছে—বঙ্গলক্ষ্মী ব্যাঙ্ক, আজ যা আছে, আর কাল যা হবে। কাল কচু হবে! নিজেকে যে কি ভাবে তার নেই ঠিক! (টোটালাইজারের চাবি টিপিতে টিপিতে) টু···ওয়ান্···নট ওয়ান্

আর আমাকে তার জন্যে গাধার খাটুনি খেটে মরতে হচ্ছে! কাজ তো করেছেন তিনি একটাই, কতকগুলো আবোল-তাবোল কথা দিয়ে একটা রিপোর্ট তৈরি করেছেন! চুলোয় যাকগে সব, জাহান্নামে যাক্! তাঁর কাজ তো তিনি করে গেলেন—আমি এখন সারাদিন বসে বসে যন্তরে খটা-খট্ করি! (কাজ করিতে করিতে) ওঃ কাজে ঘেন্না ধরে গেল!...তাহলে হল গিয়ে—এক...তিন...সাত...দুই... এক...শূন্য...! কিন্তু হুঁ হুঁ বাবা—মনে থাকে যেন—বলেছ, মাইনে বাড়িয়ে দেবে। সব যদি কায়দা মাফিক হয়ে যায়—শেয়ার-হোল্ডারেরা যদি বোকা বনে, তাহলে আমার পনের টাকা ইনক্রীমেণ্টের কথা যেন মনে থাকে!...আচ্ছা, তাহলে হল গিয়ে—(টোটালাইজারে কাজ করিতে করিতে)...কিন্তু রিপোর্টে কাজ না হলে, নালিশ চলবে না বাবা!...আমি মাথা গরম লোক একবার ক্ষেপ্‌লে খুন পর্যন্ত করে ফেলতে পারি—হুঁ হুঁ বাবা—

(ঘরের বাহিরে কর্মচারীদের অভিবাদন জ্ঞাপন ও চেয়ারম্যান সমরেশ চৌধুরীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল।)

সমরেশ। (তখনও ঘরের বাহিরে) ধন্যবাদ! আপনাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ! আপনারা আমার বন্ধু, সহকর্মী—আজ এই যে আনন্দ অভিবাদন আপনাদের কাছে থেকে পেলাম, এ আমার জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটনা হয়ে থাকবে—আমি আবার আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি—(ঘরে প্রবেশ করিয়া অক্ষয়বাবুর দিকে অগ্রসর হইয়া আসিলেন।)

অক্ষয়। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) মে আই হ্যাভ্ দি অনর্ অফ্ কন্‌গ্রাচুলেটিং ইউ অন্ দি ফিফ্‌টিন্‌থ্ অ্যানিভারসারি অফ্ আওয়ার ব্যাঙ্ক অ্যাণ্ড্ অফ্ উইশিং ইউ—

ধরিলেন) থ্যাঙ্ক্ ইউ মাই ডিয়ার অক্ষয়, থ্যাঙ্ক ইউ! জানো অক্ষয়, আজ আমার কী যে আনন্দ হচ্ছে! ইচ্ছে হচ্ছে তোমাকে একটা চুমু খাই—(অক্ষয়বাবুকে প্রায় চুম্বন করিলেন বলিয়াই মনে হইল)—(অক্ষয়কে ছাড়িয়া) না না, তুমি লজ্জা পাচ্ছ কেন অক্ষয়! এ ক-দিন তুমি আমার জন্যে কি পরিশ্রমটাই না করেছ···সত্যি বলছি অক্ষয়—ভয়ানক ইচ্ছে করছে তোমায় একটা চুমু খাই—(অক্ষয়বাবু একটু দূরে সরিয়া গেলেন)—তবু তুমি তো সম্পর্কে আমার ভগ্নীপতি! কিন্তু ব্যাঙ্কের আর সবাই? ওরাও কি আমার জন্যে কম পরিশ্রম করেছে এ ক-দিন! ওরা তো আর আমার ভগ্নীপতি নয়! ঠিক কথা বলছি কিনা বল অক্ষয়? ওরা তো সত্যিই আমার ভগ্নীপতি নয়! ভাবতে পার অক্ষয়, ব্যাঙ্কের পনেরটা বছর কেটে গেছে! আমি তো ভাবতে পারি না। একটার পর একটা বছর পড়েছে, আর মনে হয়েছে—এটা বোধ হয় আর কাটবে না! সত্যি কেটেছে তো অক্ষয়? দেখ অক্ষয়, আমার দিকে দেখ! জোর করে বলতে পারো আমিই সমরেশ চৌধুরী? (অক্ষয়বাবু ঘাড় নাড়িলেন) ঠিক অমনি জোর করে বলতে পার ব্যাঙ্কের পনেরটা বছর কেটে গেছে? (অক্ষয়বাবু আবার ঘাড় নাড়িয়া হঁ্যা বলিলেন) ব্যাস ব্যাস, তাহলে আর কোন চিন্তা নেই! তুমি যখন হঁ্যা বলেছ অক্ষয়, তখন সত্যিই পনেরটা বছর কেটে গেছে—(ব্যস্ত হইয়া)—হঁ্যা ভালো কথা, আমার রিপোর্টের কত দূর? বেশ এগুচ্ছে তো?

অক্ষয়। আজ্ঞে হঁ্যা—আর পাতা পাঁচেক বাকী আছে।

সমরেশ। বাঃ চমৎকার! তাহলে তিনটে নাগাদ রেডি হয়ে যাবে—কি বল?

অক্ষয়। যদি কোন গণ্ডগোল না হয়, তাহলে তিনটের মধ্যে নিশ্চয়ই শেষ হয়ে যাবে।

সমরেশ। বাঃ চমৎকার! (অক্ষয়ের দিকে চাহিয়া) সত্যি বলছ তো অক্ষয়? (অক্ষয় ঘাড় নাড়িলে) তাহলে তো অতি চমৎকার অক্ষয়—অতি চমৎকার! চারটেয় জেনারাল মিটিং! তাহলে এক কাজ কর—যে ক-পাতা হয়েছে আমাকে দাও—একবার চোখ বুলিয়ে নিই—(ব্যস্ত স্বরে) কই দাও—দাও—(রিপোর্ট লইয়া) এই রিপোর্টের ওপর আমার সব কিছু নির্ভর করছে! এ তো শুধু রিপোর্ট পড়া নয়—এ হবে আমার ফায়ারওয়ার্ক ডিস্‌প্লে! তুমি ভাবছ আমি বাড়িয়ে বলছি অক্ষয়! দেখ দেখ, আমার দিকে চেয়ে দেখ—(অক্ষয় দেখিলে) আমি সমরেশ চৌধুরী এটা সত্যি তো? (অক্ষয় ঘাড় নাড়িলে) তাহলে জেন, এটাও সত্যি—এ রিপোর্ট আমার ফায়ারওয়ার্ক ডিস্‌প্লে! চোখ ঝলসে দিয়ে যাব একেবারে! (বসিয়া রিপোর্ট পড়িতে পড়িতে) শরীরটা বড় ক্লান্ত মনে হচ্ছে—বাতের ব্যথাটাও বেড়েছে কাল থেকে—তার ওপর সকাল থেকে ছুটোছুটি, দৌড়োদৌড়ি, এই সব মালা-টালা পরা, গলা কাঁপিয়ে বক্তৃতা দেওয়া আর ভালো লাগে! সত্যি বড় টায়ার্ড ফিল্ করছি অক্ষয়—বড় টায়ার্ড—

অক্ষয়। (লিখিতে লিখিতে) দুই-শূন্য-শূন্য-তিন-নয়-দুই-শূন্য—কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না স্যার—শুধু দেখছি নম্বর—সবুজ কালিতে লেখা নম্বর সব সবুজ হয়ে চোখের সামনে নেচে বেড়াচ্ছে—(টোটালাইজারের চাবি টিপিতে টিপিতে) এক-ছয়-চার-এক-পাঁচ—

সমরেশ। তার ওপর সকালে আবার এক বিশ্রী ব্যাপার। মালতী এসেছিল আমাদের বাড়িতে—তোমার নামে নালিশ নিয়ে। কাল রাত্তিরে তোমার নাকি আবার মাথা খারাপের মত হয়েছিল! তুমি নাকি একটা পেন্‌সিল-কাটা ছুরি নিয়ে তাড়া করেছিলে! এ

অক্ষয়। (অপেক্ষাকৃত কঠোর স্বরে) অন্যদিন হলে হয়তো আমার সাহস হত না স্যার! কিন্তু আজ আমাদের অ্যানিভারসারি বলেই সাহস করে একটা অনুরোধ করছি! দয়া করে আমার সংসারের কথাবার্তা নিয়ে আপনি মাথা ঘামাবেন না। আপিসের কাজে এ ক-দিন যে খাটুনিটা যাচ্ছে, অন্তত তার কথা ভেবেও আমাকে রেহাই দিন—দোহাই আপনার—!

সমরেশ। তুমি একেবারে ইম্‌পসিব্‌ল্ অক্ষয়! কিন্তু তুমি তো এধারে লোক খারাপ নও! তবে মেয়েদের সঙ্গে এরকম কালাপাহাড়ের মত ব্যবহার কর কেন, বলতে পার? আমার তো কিছুতেই মাথায় আসে না—কেন তুমি মেয়েদের অত ঘেন্না কর?

অক্ষয়। আমারও একটা কথা কিছুতেই মাথায় আসে না স্যার—কেন আপনি মেয়েদের অত ভালবাসেন? (অল্পক্ষণ দুজনেই নিজের কাজে ব্যস্ত রহিলেন)

সমরেশ। বুঝলে অক্ষয়—ডিরেক্‌টরেরা আজ পার্টিতে আমাকে একটা মানপত্র আর একটা রূপোর টি-সেট্ উপহার দেবে। বাইরের পাঁচজন লোকের সামনে—বেশ চমৎকার হবে ব্যাপারটা, কি বল? আর, কিছু হোক আর না হোক, এতে ক্ষতি তো কিছু হবে না! আর তাছাড়া ব্যাঙ্কের রেপুটেশনের জন্যে এ সবও একটু-আধটু দরকার! আরে, তুমি তো ঘরের লোক, সব জানই—ও মানপত্রও আমার লেখা, আর ও টি-সেট কেনবার টাকাও আমি দিয়েছি। কিন্তু কি করি বল? নিজে থেকে কোন কিছু দেবার কথা তো তারা ভাবতেই পারে না! (চারিদিক দেখিতে দেখিতে) এ ঘরের ফার্ণিচারগুলো কি রকম কেনা হয়েছে বল তো? প্রত্যেকটা একেবারে বাছাই করা! ওরা বলে এই সব ছোট-খাট জিনিস নিয়ে আমি বড় মাথা ঘামাই। [illegible]

—লোকটা যাতে বেশ মোট-সোটা হয়—আমার নজর নাকি খালি ডোর-হ্যাণ্ডেল্‌য়ের ওপর সেগুলো যাতে সব সময় ঝক্‌ঝকে-তক্‌তকে থাকে। বলে নজর আমার এম্প্লয়িদের পোশাকের ওপর—তারা যাতে বেশ স্মার্ট্‌লি ড্রেস্‌ড্‌ হয়ে আপিসে আসে। কিন্তু তুমিই বল অক্ষয় এগুলো ছোট-খাট জিনিস ? বাড়িতে আমি যেমন তেমন করে থাকতে পারি—যা ইচ্ছে তাই করতে পারি—যেখানে সেখানে পড়ে শুয়োরের মত খানিকটা ঘুমুতে পারি—মদ খেয়ে হৈ-হল্লা করতে পারি, কিন্তু তাই বলে—

অক্ষয়। একটা অনুরোধ স্যার। দয়া করে কাউকে গালাগাল করবেন না।

সমরেশ। ওঃ তুমি সত্যিই একটা ইম্‌পসিবল্‌ লোক অক্ষয়! আমি গালাগাল কাউকে করছি না! আমি বলছি বাড়িতে যাহোক করে থাকলে চলে! কিন্তু এখানে ? এখানে প্রত্যেক ব্যাপারটার মধ্যে একটা পালিশ থাকা চাই। ভুলে যাও কেন এটা একটা ব্যাঙ্ক। এখানে প্রত্যেকটা ছোট-খাট জিনিসের মধ্যেও একটা গুরু-গম্ভীর ভাব থাকা চাই! জান অক্ষয় আমার চেয়ারম্যানশিপের বিশেষত্ব কি ? আমি এই ব্যাঙ্কের রেপুটেশন্‌কে একটা হাই লেভেলে উঠিয়েছি। কিসে সবচেয়ে বেশী এসে যায় জান অক্ষয় ? প্রত্যেক জিনিসটার সুর যেন উঁচু তারে বাঁধা থাকে। এই যে তুমি! আর একটু বাদেই ডিরেক্টরদের ডেপুটেশন আসবে, আর তুমি কিনা জামাটা পর্যন্ত পরে আসা প্রয়োজন মনে কর নি! পরে আছ একটা ছেঁড়া ময়লা গেঞ্জী যার আসল রং বার করতে গেলে রীতিমত অঙ্ক কষতে হবে। অন্ততঃ আজকের দিনের জন্যেও একটা সার্ট-টার্ট কিছু পরে আসতে পারতে তো!

চেয়ে বড় মনে করি স্যার! গা-ময় আমার ছোট ছোট ফোড়া বেরিয়েছে।

সমরেশ। (উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে) তাহলেও এ কথাটা মানবে তো, এ ঘরে তোমাকে মোটেই খাপ খাচ্ছে না? সমস্ত এফেক্ট্‌টা তোমার জন্যে স্পয়েল্‌ড হয়ে যাচ্ছে!

অক্ষয়। তাতে কিছু এসে যাবে না। তারা এলে আমি না হয় আলমারীর পাশে গিয়ে লুকোব! (লিখিতে লিখিতে) সাত-এক-সাত-দুই-এক-পাঁচ-শূন্য—বেখাপ্পা জিনিস আমি নিজেই পছন্দ করি না—সাত-দুই-নয়—(চাবি টিপিতে টিপিতে)—বেখাপ্পা কিছু আমি মোটেই সহ্য করতে পারি না! আজ আপনার বাড়ির পার্টিতে মেয়েদের নেমন্তন্ন না করলেই পারতেন!

সমরেশ। কি যা-তা বাজে বকছ!

অক্ষয়। বাজে নয়, বাজে নয়! আপনি কি ভাবছেন তা আমি জানি! ভাবছেন, শাড়ী, গয়না, আর মিহি গলার স্বর—এই তিনে মিলে চমৎকার একটা শো হবে! কিন্তু এই তিনে মিলে সবকিছু আপসেট করে দিতে পারে, তা জানেন? জানেন যত নষ্টের মূল এই মেয়েরা?

সমরেশ। আমি তো জানি উল্টোটা। মেয়েরা মানুষকে অনেক উঁচুতে উঠিয়ে দেয়!

অক্ষয়। তাই নাকি! আর মই কেড়ে নিয়ে ধপাস করে ফেলে দেয় না? এই মিসেস চৌধুরীর কথাই ধরুন না। শোনা যায় তিনি নাকি বেশ বুদ্ধিমতী! এই তো সেদিন তিনি এমন একটা কথা বলে বসলেন, যার টাল সামলাতে আমার দু-দিন গেল! এক ঘর বাইরের লোক—তার মাঝে হঠাৎ তিনি এসে আমায় জিজ্ঞেস করলেন—আচ্ছা শুনলাম, মিস্টার চৌধুরী আমাদের ব্যাঙ্কের হয়ে

নবভারত প্ল্যাস্টিক্‌সের শেয়ার কেনার পরই, শেয়ারের দাম বাজারে পড়তে আরম্ভ করেছে? ক-দিন ধরেই দেখছি ওঁর মনটা ভার হয়ে রয়েছে—তাই তোমাকে জিজ্ঞেস করছি—!—আচ্ছা আপনিই বলুন না, এসব কথা কেউ বাইরের লোকের সামনে জিজ্ঞেস করে? আমি তো কিছুই বুঝে উঠতে পারি না, কেন আপনি মেয়েদের বিশ্বাস করে এসব কথা বলেন! এর জন্যে কোন্‌দিন না আপনাকে আদালতে দাঁড়াতে হয়!

সমরেশ। ব্যাস ব্যাস ব্যাস! আজকের দিনে আর এসব কথা নয়! হ্যাঁ, ভালো কথা মনে করিয়ে দিয়েছ—(ঘড়ি দেখিয়া) অনিলার তো আসবার সময় হয়ে গেল—আমায় তো এখুনি একবার স্টেশনে যেতে হয়। কিন্তু যাই কখন—বড্ড টায়ার্ড! সত্যি কথা বলতে কি অক্ষয়—অনিলা এ সময় এখানে আস্থক—এ ইচ্ছে আমার ছিল না! তাই বলে ভেব না, সে আসছে শুনে আমি বিরক্ত হয়েছি! কিন্তু তাহলেও আর দুটো দিন থেকে এলেই পারত! সাড়ে সতের গণ্ডা ঝঞ্ঝাট বাড়ল! সন্ধ্যের পর বাড়ি থেকে বেরুনো বন্ধ, হেন-তেন! আজ আবার মিসেস মিত্রকে কথা দিয়েছিলাম খাওয়া-দাওয়ার পর একটু—অক্ষয় আমি বড় নার্ভাস ফিল্‌ করছি—মনে হচ্ছে, আর একটু বাদেই আমার দেহটা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে! অক্ষয়, এরকম হওয়া তো উচিৎ নয়! আজ একটা অ্যানিভারসারির ব্যাপার, এত নার্ভাস হলে চলবে কেন?

(পিছনের দরজা দিয়া অনিলা চৌধুরীর প্রবেশ)

সমরেশ। এই যে অনিলা, তোমার কথাই হচ্ছিল—(ঘড়ি দেখিলেন)

অনিলা। সত্যি! আমার কথা হচ্ছিল? আমাকে তাহলে খুব মিস্‌ করছিলে বল! শরীর-টরীর ভালো তো? আমারও স্টেশনে

নেমেই তোমার কথা মনে হল। জানি তুমি এখন এখানে—তাই তো মাল-পত্তর বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে সোজা এখানেই চলে এলাম। (অনিলা দেবী কথা বলেন খুব তাড়াতাড়ি মনে হয় যেন এক নিশ্বাসে সব কথা বলিয়া ফেলিতে চান।) কত যে কথা আছে বলবার, তার আর ঠিক নেই! আমার আর সবুর সইছে না! (অক্ষয়কে ব্যস্ত হইতে দেখিয়া) না না অক্ষয়, ব্যস্ত হতে হবে না—আমি এক্ষুণি চলে যাব। ভালো আছ অক্ষয়? মালু কেমন আছে—ভালো তো? (সমরেশকে) বাড়ির সব ভালো তো?

সমরেশ। ক-দিনেই তোমার শরীরটা একটু সেরেছে দেখছি। ভালোই ছিলে তাহলে সেখানে, কি বল?

অনিলা। চমৎকার! মা আর সুনীলা তোমার কথা বারবার জিজ্ঞেস করেছে—পিসিমা তোমার জন্যে জেলি তৈরি করে পাঠিয়েছে। সক্কলের তোমার ওপর খুব রাগ—চিঠি-পত্তর দাও না বলে। ওখানে যেসব কাণ্ড হচ্ছে, তা যদি জানতে! ওঃ সে কি সব কাণ্ড—আমার বলতেই ভয় করছে—কি সব ব্যাপার! কিন্তু ব্যাপার কি বল তো? তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে আমাকে এখানে দেখে খুব খুশি হও নি—

সমরেশ। খুশি হই নি!—কি যে বল তুমি! তাই কখনো আবার হয় না-কি! (ক্রুদ্ধ অক্ষয়ের গলা খাঁকারি শোনা গেল)

অনিলা। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) সুনীলাটার কথা ভেবে মনে আমার এতটুকু শান্তি নেই! বেচারী!

সমরেশ। অনিলা আজ আমাদের ব্যাঙ্কের ফিফ্‌টিন্‌থ অ্যানিভার-সারি। এক্ষুণি এ ঘরে ডিরেক্টরদের ডেপুটেশন আসবে—এ সময়, এই জামা-কাপড়ে—মানে বলছিলাম কি একেবারে স্টেশন থেকে সোজা এখানে এসেছ—

অনিলা। ও নিশ্চয়। আজ ফিফ্‌টিন্‌থ অ্যানিভারসারি। কন্‌গ্র্যাচুলেশন্‌স্‌। খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা রাত্তিরে করেছ তো? চমৎকার! ভালো কথা, মনে আছে, তুমি সেই সুন্দর স্পীচটা লিখেছিলে ওদের জন্যে! বড্ড সময় নিয়েছিল কিন্তু—(অক্ষয়ের গলা খাঁকারি)

সমরেশ। (কুণ্ঠিত স্বরে) মানে এসব কথা এখানে বলাটা ঠিক নয় অনিলা, মানে আমি বলছিলাম কি তুমি এই এলে, এখন বাড়ি গিয়ে বিশ্রাম টিশ্রাম, মানে রাত্তিরে আবার—

অনিলা। আরে এখুনি যাচ্ছি। তোমায় সমস্ত ব্যাপারট বলতে আমার এক মিনিটও লাগবে না! তাহলে গোড়া থেকে বলি শোন। তোমার মনে আছে নিশ্চয়, তুমি আমায় ট্রেনে তুলে দিয়ে এলে। আমার পাশে বসেছিলেন এক স্থূলাঙ্গী ভদ্রমহিলা, মনে আছে নিশ্চয়? তুমি তো জান, আমি বেশী কথা-টথা বলতে ভালবাসি না। গোটা তিন-চার স্টেশন চুপচাপ কেটে গেল। তারপর মনে আসতে আরম্ভ করল যত রাজ্যের কুচিন্তা। একটা বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখি সামনে বসে আছে একটি ছেলে—সবে কলেজ থেকে বেরিয়েছে বলেই মনে হল। একটু বাদে আর একটি ছেলে এসে বসল—দেখে মনে হল সেটিও স্টুডেণ্ট। তাদের ধারণা আমার বয়স নাকি পঁচিশের বেশী নয়! কম আলোয় ভালো করে দেখাও যাচ্ছিল না কিছু। আমি আবার বললুম আমার বিয়ে হয় নি। তারপর সেই রাত বারটা অবধি কি মজার মজার গল্প। হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যাবার যোগাড়। শেষকালে আবার দুজনে পালা করে আমাকে গান শোনাতে আরম্ভ করলে। (হাসিতে হাসিতে) ভাগ্যিস ভোর রাতে নেমে গেল, নইলে জানতে পেরে যেত, আমার বয়স পঁয়ত্রিশ, বিয়ে গেছে অনেক কাল। সমস্ত

এফেক্টটাই তাহলে নষ্ট হয়ে যেত। (ক্রুদ্ধ অক্ষয়ের গলা খাঁকারি আবার শোনা গেল)

সমরেশ। অনিলা, এখানে অক্ষয়ের কাজের ক্ষতি হচ্ছে। এখন বাড়ি যাও লক্ষ্মীটি, পরে সব শুনব'খন—

অনিলা। আরে তাতে কি হয়েছে! অক্ষয়ও শুনুক না—এক্ষুনি শেষ হয়ে যাবে! বুঝলে অক্ষয় ভারী ইণ্টারেস্টিং! স্টেশনে দেখি কল্যাণ গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছে। সেদিন ওয়েদারও ছিল চমৎকার—(এমন সময় বাহিরে গোলমাল শোনা গেল—ভেতরে যাবেন না—ভেতরে যাওয়া বারণ—কি চাই আপনার—) (বাহির হইতে কাদম্বিনী দেবীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল—কেন আটকাবার চেষ্টা করছেন আমাকে, আমাকে আটকাতে আপনারা পারবেন না—মিস্টার চৌধুরীর সঙ্গে আমাকে দেখা করতেই হবে—)

কাদম্বিনী। (ঘরের ভিতরে আসিয়া সমরেশকে নমস্কার করিয়া) আপনিই মিঃ চৌধুরী তো? (ব্যাকুল স্বরে) বড় বিপদে পড়ে আপনার কাছে এসেছি! আমার নাম কাদম্বিনী গাঙ্গুলী—সুরেন গাঙ্গুলীর স্ত্রী—

সমরেশ। কি চাই আপনার?

কাদম্বিনী। মানে—ব্যাপারটা হচ্ছে এই। আমার স্বামী সুরেন গাঙ্গুলী জয় হিন্দ ইন্‌সিওরেন্স কাজ করতেন। আজ সাত মাস তিনি অসুখে শুয়ে— এরই মধ্যে কোম্পানী তাঁকে বিনা কারণে ছাঁটাই করে। তারপর আমি যখন তাঁর আপিসে মাইনে আনতে গেলুম, তখন দেখি চব্বিশ টাকা ছ-আনা কম! জিজ্ঞেস করলুম, কেন? বললে, ওঁর নাকি টাকাটা আপিসে ধার ছিল। কিন্তু তা কি করে হবে মিস্টার চৌধুরী? আজ অবধি আমাকে না জানিয়ে এক পয়সাও উনি ধার করেন নি, আর একেবারে চব্বিশ টাকা ছ-আনা,

এ কি করে সম্ভব! আপনিই বলুন—আপিসের কি এটা করা উচিত হয়েছে? তাই আমি আপনার কাছে ছুটে এসেছি মিস্টার চৌধুরী! একে গরীব তায় মেয়েছেলে। আমাদের দেখবার শোনবার কেউ নেই! বাড়ি ভাড়ার আয়ে কোন রকমে সংসার চলে! স্বামীর কাছ থেকে পর্যন্ত একটা মিষ্টি কথা কখনও শুনি নি—আপনি ছাড়া আমার আর কেউ নেই মিস্টার চৌধুরী—এ টাকাটা আপনাকে উদ্ধার করে দিতেই হবে—(একখানি আবেদন পত্র বাড়াইয়া দিলেন। সমরেশবাবু আবেদনপত্র গ্রহণ করিয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেন।)

অনিলা। (ততক্ষণে অক্ষয়বাবুকে লইয়া পড়িয়াছেন) তাহলে ব্যাপারটা গোড়া থেকে বলি শোন অক্ষয়। গেল সপ্তার আগের সপ্তায় মার কাছ থেকে চিঠি পেলাম। সোমেন বলে একটি ছেলে নাকি সুনীলাকে ভালবাসে, বিয়ের প্রস্তাবও নাকি করেছে। ছেলেটি এমনিতে ভালো, কিন্তু টাকা পয়সা মোটে নেই! সুনীলাও নাকি তাকে বড্ড ভালবেসে ফেলেছে। তাই মা আমাকে লিখেছিলেন, আমি যদি গিয়ে সুনীলাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে—

অক্ষয়। (কঠোর স্বরে) মাফ করবেন, আপনি আমার হিসেবে সব গোলমাল করে দিলেন! এদিকে হিসেবের অঙ্ক, আর ও দিকে আপনি, আপনার মা, সুনীলা দেবী-কোথায়-কবে-কার সঙ্গে, আমার তো সব মিলে-মিশে একাকার হয়ে গেল!

অনিলা। হক গোলমাল হিসেবে! হিসেবে গোলমাল হলে কিচ্ছু এসে যাবে না! কোন ভদ্রমহিলা যখন কথা বলেন, তখন তাঁর কথা ভালো করে শুনতে হয় বুঝলে! আচ্ছা অক্ষয় তোমার আজ কি হয়েছে বল তো? এত ক্ষেপে রয়েছ কেন? কারো প্রেমে-টেমে পড়ে গেছ নাকি? (হাসিয়া উঠিলেন)

সমরেশ। (কাদম্বিনীকে) মাফ করবেন, এ সব কি ব্যাপার? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না!

অনিলা। কি অক্ষয়—সত্যি সত্যি কারো প্রেমে পড়েছ নাকি? এই দেখো তোমার যে কানের ডগা পর্যন্ত লাল হয়ে উঠল।

সমরেশ। অনিলা লক্ষ্মীটি, তুমি একটু ওঘরে যাও তো—এক মিনিট, আমি এক্ষুণি আসছি—

অনিলা। তাড়াতাড়ি এস কিন্তু— (অনিলা দেবীর প্রস্থান)

সমরেশ। দেখুন মিসেস গাঙ্গুলী, আমি তো এর বিন্দু-বিসর্গ কিছু বুঝতে পারছি না। তবে আপনি যে জায়গা ভুল করেছেন-একথাটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। এ আবেদন-পত্রের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্কই নেই। আপনার স্বামী কাজ করতেন ইনসিওরেন্স্ কোম্পনীতে—আবেদনপত্র আপনার সেখানেই পাঠান উচিৎ।

কাদম্বিনী। কিন্তু আমি পাঁচ জায়গায় ঘুরে তবে এখানে এসেছি। কেউ আমার দরখাস্ত পড়ে পর্যন্ত দেখে নি। কি যে করব তাই ভাবছিলাম। শেষকালে আমার জামাই বললে—জামাইটি কিন্তু আমার বেশ ভালো হয়েছে, বুঝলেন সমরেশবাবু—হ্যাঁ তা সেই জামাই আমাকে বললে—মা আপনি সমরেশ চৌধুরীর কাছে যান, তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তি আছে, তিনি ইচ্ছে করলে সব করতে পারেন। দোহাই আপনার মিস্টার চৌধুরী, আমাকে দয়া করে সাহায্য করুন!

সমরেশ। বিশ্বাস করুন মিসেস গাঙ্গুলী, এ ব্যাপারে আমি কিছুই করতে পারি না। আপনি দয়া করে বুঝতে চেষ্টা করুন, আপনার স্বামী কাজ করতেন ইন্‌সিওরেন্সে, জয় হিন্দ্ ইন্‌সিওরেন্স আর এটা হচ্ছে বঙ্গলক্ষ্মী ব্যাঙ্ক! এবার নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন ব্যাপারটা?

কাদম্বিনী। আপনি হয়তো আমার স্বামীর অসুখের কথাটা বিশ্বাস করছেন না মিস্টার চৌধুরী—কিন্তু আমার কাছে ডাক্তারের সার্টিফিকেট্ আছে! এই দেখুন আপনি যদি দয়া করে একবার পড়ে দেখেন—

সমরেশ। (বিরক্ত হইয়া) বাঃ চমৎকার! কে বললে আমি আপনার কথা অবিশ্বাস করছি! কিন্তু বিশ্বাস করুন এসবের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্কই নেই! (অনিলা দেবীর হাসির শব্দ শোনা গেল) এই দেখ, ওঘরে অনিলা আবার ওদের কাজে ডিস্‌টার্ব করছে। (কাদম্বিনী দেবীকে) যতসব অদ্ভুত কাণ্ড-কারখানা এসবের কোন মানে হয়? কোথায় আবেদনপত্র পাঠাতে হয়, তাও কি আপনার স্বামী জানেন না?

কাদম্বিনী। আমার স্বামী কিছুই জানেন না মিস্টার চৌধুরী! তাঁকে জিজ্ঞেস করতে গেলেই তিনি চেঁচিয়ে ওঠেন—তোমার ওসব খোঁজে দরকার কি? বেরোও সামনে থেকে।

সমরেশ। কিন্তু মিসেস গাঙ্গুলী—আপনি বোধ হয় ভুলে গেছেন আপনার স্বামী কাজ করতেন জয় হিন্দ ইন্‌সিওরেন্স, আর এটা ব্যাঙ্ক, বঙ্গলক্ষ্মী ব্যাঙ্ক—

কাদম্বিনী। আমি সব বুঝেছি মিস্টার চৌধুরী—এখন আপনি বললেই হয়! আপনি দয়া করে ওদের বলে দিন আমার টাকাটা দিয়ে দিতে! একবারে না পারে দু-বারে দিক—

সমরেশ। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) ওঃ—!

অক্ষয়। কিন্তু স্যার, এভাবে এগুলো রিপোর্ট কোন দিনই শেষ হবে না।

সমরেশ। আর এক মিনিট অক্ষয়! (কাদম্বিনী দেবীকে) আমার মনে হচ্ছে আপনি এখনও ব্যাপারটা বুঝতে পারেন নি।

আমাদের তরফ থেকে জয়হিন্দ ইন্‌সিওরেন্সকে অনুরোধ করার কোন মানেই হয় না। এ সেই কি রকম হল জানেন? আপনার স্বামী আপনার ওপর অত্যাচার করেন। আপনার নালিশ করবার কথা আদালতে—তা না গিয়ে আপনি এলেন কিনা এক ওষুধের দোকানে নালিশ জানাতে। (দরজার ওধার হইতে অনিলা দেবীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল—আমি কি ভেতরে আসতে পারি?)

সমরেশ। (প্রায় চীৎকার করিয়া) একটু অপেক্ষা কর অনিলা, এক মিনিট্, আমি এক্ষুণি আসছি। (কাদম্বিনী দেবীকে) আপনি আপনার স্বামীর পুরো মাইনেটা পান নি, কিন্তু তার জন্যে আমরা কি করতে পারি বলুন? তাছাড়া মিসেস গাঙ্গুলী, আজ আমাদের ব্যাঙ্কের ফিফ্‌টিন্‌থ্ অ্যানিভারসারি—মানে পঞ্চদশ বার্ষিকী। আমরা সকলেই খুব ব্যস্ত।—যে কোন মুহূর্তে কেউ না কেউ এসে পড়তে পারে—দয়া করে আজকের দিনটা আমাদের ছেড়ে দিন—

কাদম্বিনী। সমরেশবাবু, দয়া করে আমার দিকে চেয়ে দেখুন। আমি অনাথা, দুর্বল, অসহায়, আমাকে দেখবার কেউ নেই। সকাল থেকে কত ঘুরেছি—বড় ক্লান্ত মনে হচ্ছে নিজেকে—মনে হচ্ছে, আমি বোধহয় এখুনি মারা যাব। কত কাজ আমাকে করতে হয় জানেন? ভাড়া আদায়ের জন্যে আদালতে ছোটাছুটি, স্বামীর মাইনে আদায়ের জন্যে আপিসে ছোটাছুটি, বাড়ি-ঘর-দোর দেখা-শুনো—তার ওপর আবার জামাইটির আমার চাকরি নেই—

সমরেশ। দেখুন মিসেস গাঙ্গুলী, আমি—মানে—না, আপনি আমায় মাফ করুন—আমার আর কথা বলার ক্ষমতাটুকু পর্যন্ত নেই! আমার মাথার ভেতর সব যেন ঘুরছে!—মানে—আপনি যে আমাদেরই শুধু ডিস্‌টার্ব করছেন তা নয়, নিজেরও সময় নষ্ট করছেন! —(আপন মনে) ওঃ কি মোটা মাথা! কি হল? কথাটা মিথ্যে?

এ্যাঁঃ—উনি চেঁচিয়ে কথা বললেন আর আমি ভয়ে মরে গেলুম আর কি! তোমার মত অনেক কেরানী আমার দেখা আছে—বিষ নেই, তার কুলোপানা চক্কোর!

অক্ষয়। ওঃ—মুখের দিকে তাকানো যাচ্ছে না একেবারে! কী বিশ্রী! মেয়েছেলে এত বিশ্রী হয়! চোখে চোখ পড়লে রাগে সর্বশরীর জ্বলে যাচ্ছে একেবারে! দেখ, ভালো হবে না বলছি! এখান থেকে এক্ষুণি যদি চলে না যাও তো আমি তোমাকে গুঁড়িয়ে চুরমার করে দেব! কোথাকার একটা বুড়ী বজ্জাত মেয়ে-মানুষ! আমি রাগলে কিন্তু কারো নই বলে দিলুম—মেরে একেবারে জন্মের মত প্যারালিসিস্ করে রেখে দেব। বেরোও বলছি—নইলে কিচ্ছু বলা যায় না—খুন পর্যন্ত করে ফেলতে পারি!

কাদম্বিনী। তোমার মত অনেক কুকুর আমার দেখা আছে! কামড়াবার নেই ক্ষমতা—খালি ঘেউ ঘেউ! ভেবেছেন ওঁর চোখ-রাঙানীতে আমি থেমে যাব! মরে যাই আর কি!

অক্ষয়। (হাত দিয়া চোখ ঢাকিয়া) নাঃ—মুখের দিকে তাকানো পর্যন্ত যাচ্ছে না! তাকালেই গা বমি বমি করছে! কী বজ্জাত মেয়েমানুষ বাবা—(হতাশ ভাবে চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া) তখনই বলেছিলাম—তা আমার কথা শুনলে তবে তো! আপিসে মেয়েছেলে, বাড়িতে মেয়েছেলে—(চীৎকার করিয়া) এখন আমি রিপোর্ট শেষ করি কি করে, সেটা কেউ বলে দিয়ে যাক্ আমাকে!

কাদম্বিনী। ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছে দেখ! আমি যেন অন্য কারো জিনিস চাইছি! আমি কি বলেছি—আমার পাওনার চেয়ে এক পয়সা বেশী আমাকে দাও! নির্লজ্জ বেহায়া কোথাকার! গেঞ্জী পরে গুণ্ডার মত আপিসে বসে রয়েছে! ষাঁড় কোথাকার (সমরেশ ও পিছনে কথা বলিতে বলিতে অনিলা দেবীর প্রবেশ)

অনিলা। সেদিন সন্ধ্যে বেলায় ছিল রজত সেনের বাড়ি টি-পার্টি। সুনীলা পরেছিল লেশের ব্লাউজ আর সবুজ রঙের শাড়ি! চুলটা একটু ওপরে তুলে বেঁধে দিয়েছিলাম, কী চমৎকার মানিয়েছিল সুনীলাকে কি বলব!

সমরেশ। নিশ্চয় নিশ্চয়! বড় চমৎকার মানিয়েছিল!—অনিলা এক্ষুণি কেউ যদি এসে পড়ে—

কাদম্বিনী। সমরেশবাবু!

সমরেশ। (কাদম্বিনী দেবীর দিকে চোখ পড়িতে হতাশ দৃষ্টিতে) আপনি এখনও যান নি? আবার কি চাই আপনার?

কাদম্বিনী। (অক্ষয়ের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া) এই লোকটা—টেবিল ঠুকে বলে কিনা আমার মাথায় কাঠ আছে! আপনি ওকে বলে গেলেন—আমার একটা ব্যবস্থা করতে! আর ও কিনা আমায় যা নয় তাই বলে গালাগালি দিতে আরম্ভ করলে—আমাকে অসহায় পেয়ে বলে কিনা আমার হেডে মাথা নেই!

সমরেশ। ভালো কথা মিসেস গাঙ্গুলী! আপনি এখন যান—আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি—আমি খোঁজ নিয়ে দেখব, কেন অক্ষয় আপনাকে ওসব কথা বলেছে।···আপনি বরং দু-একদিন বাদে আসবেন···(মৃদুস্বরে) ওঃ কি সাংঘাতিক বাতের যন্ত্রণা হচ্ছে!

অক্ষয়। (সমরেশের নিকট আসিয়া মৃদুস্বরে) আমায় পারমিশন দিন স্যার, দরোয়ান ডেকে ওটাকে বার করে দিই! নইলে এ একটা ইম্‌পসিব্‌ল্ ব্যাপার হয়ে দাঁড়াচ্ছে!

সমরেশ। (সন্ত্রস্ত হইয়া, মৃদুস্বরে) না না—তাহলে বুড়ী এক্ষুনি চেঁচাতে আরম্ভ করবে! চারধার থেকে লোকজন ছুটে আসবে! কেলেঙ্কারির একশেষ হবে তখন!

অক্ষয়। (কাঁদ কাঁদ অবস্থায়) কিন্তু আমাকে যে রিপোর্ট শেষ করতে হবে তিনটের মধ্যে। কি করে হবে, সেটা বলে দিন?

কাদম্বিনী। তাহলে সমরেশবাবু দয়া করে বলে দিন টাকাটা কখন পাচ্ছি? আমার কিন্তু দরকার এক্ষুণি—

সমরেশ। (মৃদুস্বরে) ওঃ বুড়ীকে দেখতে কি কুৎসিত! (কাদম্বিনী দেবীকে মৃদু এবং শান্ত কণ্ঠস্বরে) দেখুন মিসেস গাঙ্গুলী আমি তো আপনাকে আগেই বলেছি, আমাদের এটা ইন্‌সিওরেন্স নয়, ব্যাঙ্ক—

কাদম্বিনী। আমার ওপর একটু দয়া করুন সমরেশবাবু—ভেবে দেখুন আমাকে দেখবার কেউ নেই—অসহায়, অনাথা স্ত্রীলোক! আপনি যদি বলেন, ডাক্তারের সার্টিফিকেটে হবে না আমি থানা থেকে সার্টিফিকেট এনে দিচ্ছি। আপনি শুধু দয়া করে আমায় টাকাটা দিয়ে দিতে বলুন!

সমরেশ। ওঃ!

অনিলা। আচ্ছা, এরা কেউ আপনাকে বলে নি, আপনি এদের কাজে ব্যাঘাত করছেন? আপনি তো আশ্চর্য মেয়েমানুষ!

কাদম্বিনী। আমার এ বিপদে সত্যিই দেখবার কেউ নেই মিসেস চৌধুরী! সত্যি বলছি, বিশ্বাস করুন—আমি খেয়ে স্বাদ পাই না, ঘুমিয়ে আরাম পাই না, আমার শোয়া বসা সব ঘুচে গেছে! আপনি বিশ্বাস করুন, আজ সকালে খানিকটা চা খেয়েছিলাম সে চাটুকুও আমার ভালো লাগে নি!

সমরেশ। (ধৈর্যের শেষ সীমায় আসিয়া পৌঁছাইয়াছেন) কত চাইছেন আপনি?

কাদম্বিনী। চব্বিশ টাকা ছ-আনা—

সমরেশ। বেশ (ব্যাগ হইতে পঁচিশ টাকা বাহির করিয়া

কাদম্বিনী দেবীর হাতে দিলেন) এই নিন্ পঁচিশ টাকা এখন দয়া করে এখান থেকে যান, আমাকে রেহাই দিন ! (আসিয়া চেয়ারে বসিলেন। ক্রুদ্ধ অক্ষয়ের গলা খাঁকারি শোনা গেল)

কাদম্বিনী। টাকাটা পাইয়ে দিয়ে সত্যিই আমার বড় উপকার করলেন সমরেশবাবু। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ !

অনিলা। (সমরেশবাবুর পাশের চেয়ারে বসিয়া হাতঘড়ির দিকে দেখিয়া) নাঃ আর থাকা চলে না—কিন্তু গল্পটা যে এখনও শেষ হয় নি। শেষ করেই যাই, কি বল ? বেশী নয়, মিনিটখানেক লাগবে। ওঃ ওখানে কি সব ব্যাপার বুঝলে ! তারপর তো যাওয়া হল রজত সেনের বাড়ি। খাওয়া-দাওয়ার চমৎকার ব্যবস্থা করেছিল সেন ! সুনীলার লাভার সোমেন, সেও ছিল ওখানে। সুনীলাকে আমি আবার আলাদা ডেকে নিয়ে গিয়ে বোঝাই, দু-ফোঁটা চোখের জল ফেলি ! সুনীলা রাজী হয়। ওখানেই সোমেনকে ডেকে তার সঙ্গে কথাবার্তা বলে সমস্ত পাট চুকিয়ে দেয়। আমি ভাবলাম যাক্, সব ঠিক হয়ে গেল ! মা খুশি হলেন, সুনীলাটাও বেঁচে গেল আমিও তাহলে এবার একটু হাঁফ ছাড়তে পারব ! তারপর কি হল জান ? চা-টা খেয়ে বাগানে বেড়াচ্ছি এমন সময় (হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া) এমন সময় বাগানের কোণের খালি ঘরটা থেকে গুলির আওয়াজ !

সমরেশ। ওঃ !

অনিলা। ছুটে গেলাম সেখানে, গিয়ে দেখি সোমেন মেঝেয় পড়ে আছে। তার হাতে পিস্তল !

সমরেশ। নাঃ, এ অসহ্য হয়ে উঠেছে ! (হঠাৎ কাদম্বিনী দেবীকে দেখিতে পাইয়া) আপনি এখনও এখানে ? আবার কি চান আপনি ?

কাদম্বিনী। সমরেশবাবু, যদি দয়া করে আমার স্বামীকে আবার চাকরিটা পাইয়ে দেন !

অনিলা। (প্রায় কাঁদিয়া ফেলিবার উপক্রম) সোজা নিজের বুক লক্ষ্য করে গুলি করেছে! সুনীলা তো সেইখানেই অজ্ঞান হয়ে গেল! ছেলেটারও কি ভয়, দু-চোখ ভর্তি জল! নিজেই ডাক্তার ডাকতে বললে দুটি হাত জোড় করে! ডাক্তার,-বদ্যি, ছুটো-ছুটি! ডাক্তার এসে ভাগ্যিস বল্‌লে, গুলিটা বুকের আধহাত ওপর দিয়ে গেছে! নইলে হয়েছিল আর কি!

কাদম্বিনী। বড় উপকার হয় সমরেশবাবু, যদি আমার স্বামীকে চাকরিটা আবার পাইয়ে দেন—

সমরেশ। (প্রায় কাঁদিয়া ফেলিবেন এইরূপ অবস্থা, অক্ষয়ের নিকট আসিয়া দুই হাত জোড় করিয়া) এ আর সহ্য হচ্ছে না অক্ষয়, যা হোক করে ওটাকে বার করে দাও, যেমন করে পার!

অক্ষয়। (সোজা অনিলার নিকট আসিয়া) বেরোও এখান থেকে!

সমরেশ। না না, ওকে নয়—ওটাকে, ওই বুড়ীটাকে—(কাদম্বিনী দেবীর দিকে ইঙ্গিত করিলেন।)

(অক্ষয়বাবুর মুখ দেখিয়া স্পষ্টই মনে হইল, তিনি সমরেশবাবুর কথা বুঝিতে পারেন নাই।)

অক্ষয়। (অনিলা দেবীকে) বেরোও শিগ্‌গির এখান থেকে! (মেঝেতে পা ঠুকিয়া) বেরোও বলছি!

অনিলা। (ভীত স্বরে) অক্ষয়, তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল। এসব কি বলছ তুমি?

অক্ষয়। (অনিলা দেবীকে) বেরোও বলছি এখান থেকে! নইলে একেবারে জন্মের মত পঙ্গু করে দেব। খোড়-কুচো করে ছেড়ে দেব! বেরোও শিগ্‌গির, নয় তো যাচ্ছেতাই কাণ্ড করে বসব!

অনিলা। (চেয়ার হইতে উঠিয়া, অক্ষয়ের নিকট হইতে দৌড়াইয়া

পলাইতে পলাইতে) তোমার আস্পর্ধা তো কম নয় ! অসভ্য, অভদ্র, বেয়াদব কোথাকার—(পিছনে অক্ষয়কে আসিতে দেখিয়া, ছুটিতে-ছুটিতে) সমরেশ আমাকে বাঁচাও (ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন) সমরেশ !

সমরেশ। (অক্ষয়বাবুর পিছনে পিছনে) অক্ষয়, দোহাই তোমার এবার থাম ! আমি জোড়হাত করে বলছি তোমাদের, একটু চুপ কর ! ওঃ, মান-ইজ্জত সব গেল !

অক্ষয়। (এতক্ষণে কাদম্বিনী দেবীকে দেখিতে পাইয়া, তাঁহার পিছনে ছুটিতে ছুটিতে) বেরোও এখান থেকে, বেরোও বলছি ! এই কে আছিস ? ধর তো ওটাকে ! মেরে মোণ্ডা বানিয়ে ছেড়ে দেব ! ঘুঁষিয়ে দলা পাকিয়ে রেখে দেব একেবারে !

সমরেশ। অক্ষয়, দোহাই তোমার। আমি হাত-জোড় করছি ! এইবার থামো অক্ষয় !

কাদম্বিনী। (ঘরময় ছুটিতে ছুটিতে) সমরেশবাবু, লোকটার মাথা খারাপ ! দোহাই আপনার, পাগলের হাত থেকে বাঁচান ! ও যদি কামড়ে দেয়, তাহলে আমি আর বাঁচব না ! নারায়ণ, শ্রীমধুসূদন, পাগলের হাত থেকে বাঁচাও, রক্ষে করো প্রভু !

অনিলা। (চীৎকার করিয়া) কে কোথায় আছ, বাঁচাও ! নইলে আমি অজ্ঞান হয়ে যাব ! (একটি চেয়ারের উপর লাফাইয়া উঠিয়া, সেখান হইতে একটি সোফার উপর লাফাইয়া পড়িলেন) ওগো শুনছ, আমি বোধ হয় সত্যি অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছি, শুনছ (এই কথা বলিতে বলিতে অর্ধমূর্ছিতের ন্যায় অবস্থায় সোফার উপর বসিয়া পড়িলেন।)

অক্ষয়। (কাদম্বিনী দেবীর পিছন পিছন) মেরে ফেলে দেব ! কেটে ফেলে দেব ! ছাল ছাড়িয়ে আনব !

কাদম্বিনী। ভগবান রক্ষে করো! ওগো আমার চোখের সামনে সব অন্ধকার হয়ে আসছে যে—(এই কথা বলিতে বলিতে সমরেশবাবুকেই একমাত্র আশ্রয় ভাবিয়া, তাঁহার বুকের উপর প্রায় অর্ধ-মূর্ছিতের ন্যায় হেলিয়া পড়িলেন। দরজার বাহিরে মিলিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল—ডেপুটেশন্-ডেপুটেশন্!)

সমরেশ। (তাঁহার অবস্থা প্রায় পাগলের মত। আবোল-তাবোল বকিতেছেন।) ডেপুটেশন্—না না ডেপুটেশন্ তো নয়, রেপুটেশন্—অ্যাঁঃ রেপুটেশন্ কে বললে—অকুপেশন্—

অক্ষয়। (তখনও মেঝের পা ঠুকিতেছেন) বেরোও—বেরোও বলছি এখান থেকে! তবে রে তোর নিকুচি করেছে—(জামার আস্তিন গুটাইয়া) একবার ধরতে পারি তোমায়! খুন করে ফেলে দেব একেবারে! (ইতিমধ্যে পরিচালকমণ্ডলীর পাঁচজন সদস্যের প্রবেশ) একজনের হাতে ভেলভেটের কভারে বাঁধান একটি মানপত্র, আর একজনের হাতে রৌপ্য-নির্মিত একটি টি-সেট। তাঁহারা আসিয়া দেখিলেন অনিলা দেবী সোফার উপর অর্ধমূর্ছিত অবস্থায় প্রায় শুইয়া আছেন বলিলেই হয় এবং সমরেশ চৌধুরী দুই বাহুর মধ্যে প্রায়-মূর্ছিত কাদম্বিনী দেবীকে লইয়া হতভম্বের ন্যায় দাঁড়াইয়া আছেন।)

সদস্য। (মানপত্র পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন) মাননীয় শ্রীসমরেশ চৌধুরী সমীপেষু—বন্ধুবর! আজিকার এই শুভদিনে অতীতের বিস্মৃত দিনগুলির কথাই আমাদের বার বার মনে পড়িতেছে। মানস-নেত্রের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিতেছে এই ব্যাঙ্কের ক্রমোন্নতির ইতিহাস। মনে মনে এক অনির্বচনীয় তৃপ্তি ও সন্তোষ অনুভব করিতেছি। অবশ্য আমরা জানি, প্রথম দিকে অল্প মূলধনের জন্য আমাদের ব্যাঙ্ক বিরাট একটা কিছু করিয়া উঠিতে পারে নাই। ব্যাঙ্কের অনির্দিষ্ট কর্ম-পন্থা দেখিয়া অনেকেরই সন্দেহ হইয়াছিল।

মনে জাগিয়াছিল হ্যাম্‌লেটের প্রশ্ন—টু বি অর্‌ নট্‌ টু বি। আমাদের মধ্যে কেহ কেহ কথাও তুলিয়াছিলেন, ব্যাঙ্ক তুলিয়া দেওয়া হউক। এমন সময় আপনি আপনার বৃষ-স্কন্ধে ব্যাঙ্কের ভার তুলিয়া লইলেন। আপনার জ্ঞান, আপনার শক্তি, আপনার ক্ষুর-ধার বুদ্ধি ব্যাঙ্ককে সাফল্যের উচ্চতম শিখরে পৌঁছাইয়া দিয়াছে—(কাদম্বিনী দেবী গোঙাইয়া উঠলেন—ও—ও—)

অনিলা। জল! একটু জল!

সদস্য। আজ আমাদের ব্যাঙ্কের ডেপুটেশন—না না—মানে খ্যাতি—

সমরেশ। ডেপুটেশন—রেপুটেশন্—অকুপেশন্—না না—অকুপে-শন—ডেপুটেশন—রেপুটেশন—(হঠাৎ কথকতার সুরে)

একদিন দুই বন্ধু গেল বেড়াইতে,
বেড়াইতে বেড়াইতে তারা লাগিল বলিতে ;
বলো না যৌবন তোমার হইয়াছে নষ্ট,
আমার কারণে তুমি পাইয়াছ কষ্ট।

(কাদম্বিনী দেবী তখন আরও জোরে গোঙাইতেছেন।)

সদস্য। মানপত্রের কিছু অংশ ছাড়িয়া দিয়া) আজ ব্যাঙ্কের বর্তমানের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাই—

অনিলা। জল! একটু জল!

সদস্য। দেখিতে পাই, মানে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাই—(কাদম্বিনী দেবীর গোঙানি আরও জোর হইয়া উঠিয়াছে। অক্ষয়বাবু পুনরায় পা ঠুকিতে আরম্ভ করিয়াছেন ও বেরোও বেরোও করিতেছেন) —মানে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাই, মানে বর্তমানে আমাদের মানপত্র পাঠ স্থগিত রাখাই বিধেয়! (একে অপরের মুখের দিকে তাকাইতে তাকাইতে কিংকর্তব্য-বিমূঢ় অবস্থায় সদস্যেরা ঘর হইতে

বাহির হইয়া গেলেন। সমরেশবাবু তখনও ছড়া কাটিতেছেন, বাকী সকলের, অর্থাৎ কাদম্বিনী দেবী, অক্ষয়বাবু এবং অনিলা দেবীর অবস্থারও কোন পরিবর্তন নাই। ঠিক এই অবস্থায় পর্দাও নামিয়া আসিল।)

—যবনিকা—